বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

১৩শ অধিবেশন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন।

ত্রয়োদশ অধিবেশন—মেদিনীপুর।

সভাপতির অভিভাষণ।

সভাপতি

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্-এ; বি-এল,

শ্রীকণ্ঠ, ভক্তিভূষণ।

বরাহনগর,

১৩২৯ সাল, ১লা বৈশাখ।

মাতৃ-ভাষা-ভক্ত সমবেত ভদ্রমহোদয়-গণ !

অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এবং মেদিনীপুর-বাসী একজন ভদ্র মহোদয় যখন একদিন আমাকে বর্ত্তমান সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিপদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে আসেন, তখন আমি সর্ব্বপ্রথমে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলাম। এমন কি, মনে হইতেছিল যে, তাঁহারা হয়ত ভ্রমবশতঃ অন্যের বাটী মনে করিয়া আমার নিকটে আগমন করিয়াছেন ; কিন্তু ঐ প্রকার ভাবিবার বড় অবকাশ ছিল না। চকিতের মত ঐ ভাবটী আমার মনে উদিত হইয়াই লীন হইয়াছিল। কারণ, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় আমার বহু-দিনের পরিচিত বন্ধু ; তিনি যখন উপস্থিত, তখন আমার সম্বন্ধে কোনও ভ্রম ঘটিতে পারে না। ইহাতে বুঝিলাম, আমাকে বিপন্ন করিবার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত হইয়াই আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। আমাকে ত্যাগ করিয়া যথার্থ যোগ্যতর ব্যক্তিকে সভাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাহার জন্য অনেক অনুনয় এবং অশেষ চেষ্টাতেও যখন বিফল হইলাম, এমন কি, তাঁহাদের নিকটে বিবেচনা করার জন্য অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টার অবকাশ প্রার্থনা করিয়াও যখন নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলাম না, তখন আমাকে অগত্যা সভাপতির পদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইল। তাই আজ আমি আপনাদের সম্মুখে সভাপতি-রূপে দণ্ডায়মান

হইয়াছি। এই প্রকার বিদ্বন্মণ্ডলীর সভাপতিত্ব-রূপ গুরুভার গ্রহণ করিবার শক্তি আমার নাই। আমার এই কথাটা আপনারা মামুলী বিনয় ও দৈন্য প্রকাশ বলিয়া উড়াইয়া দিবেন না। কারণ, আমার অক্ষমতা আমি যতটা জানি, ততটা অন্যের জানা সম্ভবপর নহে। এই অবস্থাতেও আমি যে কেন এখানে এইভাবে উপস্থিত হইয়াছি, তাহার কারণ নিম্নে লিখিলাম; তৎপ্রতি প্রণিধান করিলে কৃতার্থ হইব। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে অদ্য যে সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি আপনাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি, এই সভার ব্যাপার নির্ব্বাহ-পক্ষে আমার যে সকল ভ্রম-প্রমাদাদি ত্রুটি ঘটিবে, তাহা আপনারা করুণার চক্ষে দর্শন করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। এতদ্ব্যতীত আমার এই ক্ষমা প্রার্থনা করিবার অন্য একটী বিশিষ্ট অধিকারও আছে। কারণ, আপনারা আমাকে যখন সভাপতি-রূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, তখন আমার কাজের দোষ-গুণ গৌণভাবেও অন্ততঃ আপনাদিগের উপর বর্ত্তিবে; সুতরাং আমি সে বিষয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত আছি। আপনাদের সমবেত প্রেরণাই আমাকে কর্ত্তব্য কার্য্যে চালিত করিবে, সেই ভরসা প্রভূত-প্রকারে আমাকে বল-সঞ্চার করিয়াছে ও করিবে।

আমি অতি ক্ষুদ্র, ইহা জানিয়াও কেন এই প্রকার গুরুভার গ্রহণ করিলাম, তৎসম্বন্ধে একটী কৈফিয়ৎ দিব, ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। এক্ষণে ঐ বিষয়ে আমার বক্তব্য প্রকাশ করিতেছি।

অদ্য যে আসন আপনারা কৃপা করিয়া আমাকে দিয়াছেন, সেই আসন যে যে মহাত্মা ইতঃপূর্ব্বে সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম মনে হইলে এবং তাঁহাদের অভিভাষণের কথা স্মরণ হইলে, আমার মনে এক প্রকার জড়তা না আসিয়াই পারে না। স্বতঃই মনে চিন্তা উপস্থিত হয় যে, আমি কি উপহার লইয়া এই শিক্ষিত-মণ্ডলীর নিকটে উপস্থিত হইব! কবিকুল-চূড়ামণি ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে আসনে বসিয়া তাঁহার বীণা-বিনিন্দী কণ্ঠস্বরে যে সকল সারগর্ভ কথা শুনাইয়াছেন; আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু যেখান হইতে তাঁহার আবিষ্কার-কাহিনী এবং ভাবময় জগৎ ও জড় জগতের অদ্ভুত সমন্বয় স্বরূপ "এই যেন" এবং "এই সেই" এই দুই বাক্যের দ্বারা প্রাচীন ভারতের ঋষিজুষ্ট তপোবনে উদ্ভাসিত চরম সত্যকে পুনরায় বিংশ শতাব্দীর উপযোগী করিয়া আমাদিগকে শুনাইয়া, উদ্ভ্রান্ত আমাদিগকে চরম সত্যের পথে আবাহন করিয়াছেন; যেখানে বসিয়া বিজ্ঞান-শাস্ত্রে পারদর্শী আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, দেশে স্বাধীন চিন্তা এবং মৌলিক গবেষণার অভাব-দর্শনে অশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া, যাহাতে ঐ সকল এই দেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার পথ দেখাইয়া, জ্ঞান-বৃদ্ধির উপায় বলিয়া দিয়াছেন; সে আসনে বসিয়া নূতন কথা বলা অতীব দুরূহ; এমন কি, আমার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। জগদ্-বিশ্রুত-কীর্ত্তি, পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ, মদীয় গুরু, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে আসনে বসিয়া বাঙ্গালী জাতির নানাপ্রকার গৌরব-

কাহিনী আমাদিগকে শুনাইয়া মৃতকল্প বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ে নূতন সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করিয়াছেন ; দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ যেখান হইতে নানা উপাদেয় তত্ত্বকথা শুনাইয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন, যেখান হইতে অশেষ প্রতিভাশালী বিদ্বদ্বরেণ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ সরস্বতী মহাশয় মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার জ্বলন্ত অনুরাগ, তাঁহার সুললিত এবং ভাবোচ্ছ্বাস-পূর্ণ মধুর ভাষায় ঝঙ্কৃত করিয়া দেশমধ্যে আমাদের মাতৃভাষার গৌরব অশেষ প্রকারে বাড়াইয়াছেন, যেখানে স্বর্গত সারদাচরণ মিত্র এবং স্বর্গত সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় রীতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়া আমাদের মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে নানা উপদেশ-পূর্ণ বাণী আমাদিগকে শুনাইয়া আমাদের মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছেন, যেখানে সংস্কৃত ও পালিভাষাবিৎ এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শনাদি সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ, আমাদের সকলের প্রিয় মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সংস্কৃত ভাষা হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা-ভাষার ইতিহাস এবং গতি সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা শুনাইয়া আমাদিগের জ্ঞান-পিপাসা-নিবৃত্তি করিয়াছেন ; যে আসনে বসিয়া মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ, বঙ্গ-ভাষাই আমাদের যাবতীয় শিক্ষার "বাহন" হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া, সর্ব্ব-প্রথমে স্পষ্ট ভাষায় অশেষ যুক্তি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক বঙ্গবাসীকে মাতাইবার চেষ্টা করিয়াছেন ; সর্ব্বসৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, আশ্রয়দাতা সাহিত্য-সেবিগণের

চিরসুহৃৎ, নানা সদ্‌গুণবিভূষিত এবং সুপণ্ডিত মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী যে আসনে উপবিষ্ট হইয়া, বঙ্গভাষার উৎপত্তি এবং গতি বিষয়ে নানা সারগর্ভ কথার অবতারণা করিয়া, আমাদের সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছেন, সেই আসনে বসিয়া আমি আপনাদের যোগ্য কোনও নূতন কথা শুনাইতে পারি, সে আস্পর্দ্ধা আমার নাই। এই সকল কারণে আমি অনেক বিবেচনা-পূর্ব্বক স্থির করিয়াছি যে, আমি এখানে এই সমবেত শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের নিকটে কোন নূতন অর্ঘ্য উপহার দিতে কোনও চেষ্টা করিব না; কেবল বঙ্গভাষার প্রকৃতপক্ষে বিস্তার-কল্পে যাহা যাহা করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমি বহুদিন হইতে ভাবিয়া আসিতেছি, তাহারই প্রসঙ্গ আপনাদের এই দরবারে পেশ করিব। পূর্ব্ববর্ত্তী মনস্বিগণ বোধ হয়, তদানীন্তন-কালে সময়োপযোগী নহে বলিয়াই ঐ বিষয়ে বিস্তৃতরূপে বলেন নাই—এখন সময় আসিয়াছে, এখন আর মতভেদ বড় নাই বলিলেও চলে, সুতরাং এখন আর শুধু বঙ্গবাণীর মহিম-কীর্ত্তনই প্রচুর নহে—যাহাতে আমাদের মাতৃভাষা নিজ অধিকার লাভ করিতে পারেন, তৎসম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ এবং তাহা কার্য্যতঃ পরিচালন করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। আশা করি, আপনারা সকলে আমার প্রস্তাব গ্রহণীয় হইলে, তাহা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহাতে বদ্ধ-পরিকর হইবেন। আর যদি আমার প্রস্তাবে কোনও ত্রুটী থাকে, তবে আপনারা বিচার করিয়া, তাহা সংশোধন করুন এবং উপযুক্ত প্রস্তাবাদি গ্রহণ

করিয়া, যাহাতে তাহা বাস্তব করা যাইতে পারে, তৎপক্ষে কৃতসঙ্কল্প হউন। এখানে যে বঙ্গভাষার বিস্তার-কল্পে প্রস্তাব করিব বলিতেছি, তাহার একটু হেতু আছে, তৎপ্রতি প্রণিধান করিবেন। বঙ্গভাষার উন্নতি এবং বিস্তৃতি সর্ব্ব-জন-বাঞ্ছনীয় এবং সে সম্বন্ধে মতভেদ কখনও কাহারও ছিল না, এখনও নাই। সুতরাং উহার প্রকৃত বিস্তার-কল্পে যে যে প্রস্তাব আমি করিব, তাহার অর্থ এই,—যে উপায় বা যে সকল উপায় অবলম্বিত হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের মাতৃভাষা তাঁহার প্রকৃত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তাহার উপায় এবং তৎসম্বন্ধে আমাদের ইতিকর্ত্তব্যতা কি, তাহা নির্ণয় করাই আমার প্রস্তাব গুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। আপনারা কৃপা করিয়া আমার প্রস্তাব গুলিকে ঐ অর্থেই গ্রহণ করিলে সুখী হইব। অযোগ্য হইয়াও আমি যে কেন এই সম্মিলনীর সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি, তাহার কারণ এখন আপনারা বুঝিবেন। বহুদিন হইতে ভাবিয়া আসিতেছি, এমন কি, সময় সময় স্বপ্নেও দেখিয়াছি যে, আমাদের মাতৃভাষার বর্ত্তমান অবস্থা থাকিবে না, থাকিতে পারেও না। এমন সময় একদিন নিশ্চিতই আসিবে, যে দিন আমাদের দেশের শিক্ষা কেবল মাতৃভাষার দ্বারাই দেওয়া হইবে। এই কথাটা আমি নানা স্থানে নানা ভাবে প্রস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক-রূপে আমি যখন উহার সেবক ছিলাম, তখন একবার লিখিয়াছিলাম,—"The Bangiya Sahitya Parisad has. one goal

in its view. It dreams of a day when it will be possible fo the Bengali speaking people of this country to have all higher learning imparted to them through the medium of the Bengali language. That day may be distant, but it is none the less incumbent upon our countrymen to set themselves at once to the supreme task of doing all the preliminaries by way of clearing the ground and removing obstacles and difficulties so as to facilitate the easy and rapid attainment of the final goal which we all have in our view. With the help of our benign Government and the benefactors like the Maharajah of Cossimbazar, the Raja Bahadur of Lalgola, the Maharajadhiraj of Burdwan and several others, the Parishad hopes to rise to a height from which the promised land will be directly in our view. The net result, up to now, of our labours in this direction, has been only to collect bricks and mortar for the building of the splendid national edifice sketched out in the preceding lines. Nothing will be more gratifying • to the original founders of the

Parishad than to see during their life-time that their idea has taken firm root in the minds of their countrymen and that some beginnings have been actually made for the realization of their vision. May God vouchsafe the fruition of their hopes—is their humble prayer." এই ভাব পোষণ করি বলিয়া অনেক লোকের নিকটে কত প্রকার বিদ্রূপ যে শুনিতে হইয়াছে, তাহা শুনাইয়া আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করিব না। এখন হাওয়া ফিরিয়াছে, এখন শিক্ষার "বাহন" সম্বন্ধে দেশের লোকের মতিগতি বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং আমাদের একপ্রকার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আমি আজীবন যাহা কল্পনা-চক্ষে দেখিতাম, তাহা এখন যে শুধু প্রকাশ করিবার সুবিধা হইয়াছে, তাহা নহে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার একান্ত চেষ্টা করার সময় এবং সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাই আমি ভাবিতেছি যে, আমার ক্ষীণ-কণ্ঠের ধ্বনি দেশ-মধ্যে তাদৃশ মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে না পারিলেও আপনারা কৃপা করিয়া আমাকে যে পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, অন্ততঃ সেই পদের খাতিরে দেশের ও দশের নিকটে আমার কথাটা উপেক্ষিত হইবে না। অতএব আমার প্রস্তাবগুলি যথাযথরূপে আপনারা বিচার করিয়া, গ্রহণীয় হইলে তাহা গ্রহণ করিবেন, এবং প্রস্তাবগুলি (আমার উদ্দেশ্য নহে, কারণ তাহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত)

বর্জ্জনীয় হইলে, তাহার স্থানে নূতন সুষ্ঠুতর প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ও ফল-সাধনোপযোগী নূতন প্রস্তাব উদ্ভাবন করিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন এবং অচিরে যাহাতে তাহা কার্য্যে পরিণত হয়, তাহাও করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবেন। মূল উদ্দেশ্য সাধিত করাই আমার অভিপ্রায়। আমার প্রস্তাবিত প্রণালীগুলি যে সর্ব্বাংশে গৃহীত হইবে, এ কথা আমি বলি না এবং তাহা সম্ভাবিত নহে। উদ্দেশ্যানুকূল সাধন কি কি হওয়া উচিত, তাহার বিচার আপনারা করিবেন, আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যে প্রস্তাবগুলি সমীচীন বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিব; বিচারক আপনারা, কার্য্য করিবেনও আপনারা। তবে আমার অভিপ্রায় এই যে, মামুলিভাবে প্রস্তাবাদি যেমন গৃহীত বা প্রত্যাখ্যাত হয়, আমার বর্ত্তমান প্রস্তাবগুলি যেন তদ্রূপ না ঘটে। এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিব।

মাননীয় সরস্বতী মহাশয়ের মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ দেখিয়া আমি বাস্তবিক মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, "রাসিয়ান,—গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত, ফরাসী প্রভৃতির ন্যায় বঙ্গভাষাও পৃথিবীর তাবৎ শিক্ষাকেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ-গণের অন্যতম আলোচনীয়-রূপে গৃহীত হইবে।" "একদিন যেমন বৈদিক সাহিত্য শিক্ষিত ভারতবাসীর আত্ম-সাহিত্য ছিল, আজ বঙ্গ-সাহিত্যকে সমগ্র ভারতের সেইরূপ আত্ম-সাহিত্য করিতে হইবে।" এই প্রকার মাতৃভাষার গৌরবের কথা মাননীয় সরস্বতী মহাশয়ের মুখে

শুনিলে কোন্ বঙ্গবাসীর মনে না যুগপৎ আশা ও আনন্দের সঞ্চার হয় ? তিনি স্থানান্তরে প্রকাশ করিয়াছেন,—"যখন বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাড়া দেশে আর কোনও শিক্ষার কেন্দ্র নাই, বা থাকিলেও তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে, তখন যদি দেশের শিক্ষার সম্বন্ধে কোনরূপ কিছু অদল-বদল করিতে হয় বা নূতন কিছু করা দরকার হয়, তবে তাহা ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়াই করিতে হইবে।" আমি বলি বাঢ়ম্। কিন্তু সরস্বতী মহাশয় শিক্ষার কেন্দ্র যে বিশ্ববিদ্যালয়, তাহাতে কি কি পরিবর্ত্তন করিলে যে তাঁহার ঈপ্সিত বিষয়টী বাস্তব হইতে পারে, তাহার বিষয়ে বিশেষ কিছু বিস্তার করিয়া বলেন নাই। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে ভাবগত ঐক্য-স্থাপনোদ্দেশ্যে দেশীয় ভাষায় এম, এ, পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন এবং তাহা কার্য্যতঃ আরম্ভও করিয়াছেন। তাহাতে তিনি আশা করেন,—"ফলে দাঁড়াইবে এই, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা, দীক্ষা, মতিগতি, সমস্ত ক্রমে এক হইতে আরম্ভ হইবে। সমগ্র ভারতবর্ষে একটা ভাবগত ঐক্যের সাড়া পড়িবে।" দেশীয় ভাষায় এম, এ, পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়া সরস্বতী মহাশয় যে সমীচীন কার্য্য করিয়াছেন, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন ? কিন্তু তথাপি আমাকে সত্যের খাতিরে বলিতেই হইবে যে, আমাদের মাতৃভাষার উপযুক্ত বিস্তার-পক্ষে উহাই প্রচুর নহে আমাদের দেশে বঙ্গবাণীর আসন একমাত্র সম্রাজ্ঞীর আসন ; তাহা যতদিন স্থাপিত না হইতেছে, ততদিন আমরা কিছুতেই সুস্থ

এবং সম্পূর্ণ-রূপে পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের মায়ের আসন একচ্ছত্র হওয়া চাই; অন্য আসনের পার্শ্বে, তাঁহার বহুমূল্যের আসন হইলেও, তাহাতে বঙ্গবাসী সন্তুষ্ট হইতে পারে না। ভরসা করি, সাহিত্য-সম্মিলনও সন্তুষ্ট হইবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার-সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে কমিশন বসিয়াছিল, তাহার প্রশ্নাবলীর উত্তরে এই সম্পর্কে আমি যাহা জানাইয়া ছিলাম, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রদানের যে বিধান আছে, তাহা দ্বারা দেশীয় যুবকবৃন্দের উচ্চশিক্ষা-লাভের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ঘটিতে পারে না। এই অসুবিধার কারণও সুস্পষ্ট। পরন্তু ইহাই বিস্ময়ের বিষয় যে, অদ্যাবধি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট কিংবা জন-সাধারণের মনোযোগ এতৎসম্বন্ধে যে ভাবে আকৃষ্ট হওয়া উচিত ছিল, তদ্রূপ কিছুই হয় নাই। বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষে সমগ্র উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা কেবল ইংরাজী-ভাষার সাহায্যেই হইয়া থাকে, এই বিচিত্র অবস্থাই ভারতে উচ্চ-শিক্ষার প্রসারণ এবং পরিপুষ্টি-পক্ষে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। কোন একটী বৈদেশিক ভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করাই অতি দুরূহ ব্যাপার; সুতরাং বিদেশীর ভাষা ব্যতীত উচ্চ শিক্ষালাভের উপায়ান্তর না থাকায়, প্রকৃতপক্ষে এ দেশে উচ্চ উচ্চ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার এবং ঐ জ্ঞান-বিস্তার করিবার পথ এক প্রকার অবরুদ্ধ বলিলেও চলে। দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে এই সমস্যাটী অতীব

জটিল এবং এই প্রশ্নের সুমীমাংসা করিবার জন্য বিধিবদ্ধ-ভাবে অদ্যাবধি কোনরূপ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। বিদেশীয় ভাষার সাহায্যেই শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা থাকাতে ছাত্রবৃন্দ সেই শিক্ষাকে পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, এ কথা প্রমাণ করিতে কোন প্রয়াস করার প্রয়োজন হইবে না; অধিকন্তু বাল্যকাল হইতে আমাদের বালকবৃন্দকে ভাষা হিসাবে শিক্ষা ব্যতীত প্রায়শঃ সর্ব্ববিধ শিক্ষাই ইংরাজী ভাষায় লাভ করিতে হয়। এইরূপ অসমীচীন ভিত্তির উপরেই সমগ্র শিক্ষাপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, আমাদের বালকগণের শিক্ষা বিষয়ে অনুরাগ ও উৎসাহের মূল পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এবং আমাদের দেশের শিক্ষা-বিষয়ক সমস্ত ব্যাপারগুলিকে দূষিত করিয়াছে। আপাততঃ এই মাত্র সুখের বিষয় যে, আমাদের দেশের উচ্চতম রাজপুরুষের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে।

"প্রাথমিক শিক্ষাই বল, আর উচ্চ শিক্ষাই বল, উভয়ের উদ্দেশ্য এক। কারণ, উভয়বিধ শিক্ষাই শিক্ষার্থীকে উদার-চরিত, সৎ এবং খাঁটি মানুষরূপে গড়িয়া তুলিতে চায়। যে শিক্ষার দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি সকল পূর্ণভাবে বিকসিত হইয়া উঠে, সেই শিক্ষাই সর্ব্বোত্তম বলিয়া গণ্য। সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য শিক্ষার্থীকে বিশুদ্ধ জ্ঞানদান করা এবং মহান্ ও উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান কালে কোন না কোন ভাষার সাহায্য ব্যতীত ঐ প্রকার শিক্ষা-দানের

ব্যবস্থা হইতেই পারে না। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, মাতৃভাষাই শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও সুবিধা-জনক উপায়। একেই ত উচ্চ-শিক্ষালাভ করা দুরূহ, তাহার উপর কঠিন বিদেশীয় ভাষার সাহায্যে সর্ব্ববিধ শিক্ষালাভের ব্যবস্থা থাকায়, উচ্চশিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করা যে দুরূহতর হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কেহ-কেহ বলিয়া থাকেন যে, এই ভাষা-সঙ্কট অতিক্রমপূর্ব্বক ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ নানাবিধ উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া জগতের সমক্ষে বিশেষ কৃতিত্ব খ্যাপন করিয়াছে। ভারত-বাসীর বুদ্ধির প্রাখর্য্য এইভাবে স্বীকৃত হওয়ায় আমি যে ভারতবাসী বলিয়া অন্তরে গৌরব অনুভব না করি, এরূপ নহে; কিন্তু সেই সঙ্গে আমি ইহাও নিবেদন করিতে চাহি যে, বর্ত্তমান ভাষাসঙ্কট বজায় রাখিয়া যেন আমাদের এই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি-সম্পৎকে অকারণে অফলপ্রসূ করিয়া না ফেলা হয়; বরং, যাহাতে আমাদের ছাত্রবৃন্দের বুদ্ধি এবং জ্ঞানানু-সন্ধিৎসার প্রবৃত্তিকে ভাষা-সঙ্কট হইতে, অর্থাৎ কঠিন বৈদেশিক ভাষা শিক্ষার পাষাণ-চাপ হইতে, মুক্তি দিয়া স্বাভাবিক-ভাবে উহারা যাহাতে বর্দ্ধিত হইবার অবকাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা করিলে তবে আমাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির উপযুক্ত সদ্-ব্যবহার করা হইবে। পূর্ব্বে যাহা বলিলাম, তাহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহাতে ভারতীয় ছাত্র-বৃন্দ নিজ মাতৃভাষায় সর্ব্বপ্রকার শিক্ষালাভ করিতে পারে,

তদ্বিষয়ে যত্নশীল হওয়া সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয় বলিয়া আমি নির্দ্দেশ করিতেছি। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, আমার এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা এখন অতি দুরূহ বলিয়াই গণ্য হইবে। ইহাও আমি জানি যে, বর্ত্তমানে ভারতীয় কথিত ভাষা সকল যে পরিমাণে পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহাতে ঐ সকল ভাষাকে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার,—বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষার, উপায়-স্বরূপ গ্রহণ করাও সুকঠিন। কিন্তু আমরা যদি স্বীকার করি (এবং যাহা স্বীকার করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই) যে, ছাত্রবৃন্দকে নিজ নিজ মাতৃভাষায়, অর্থাৎ তাহাদের কথোপকথন এবং চিন্তা করিবার ভাষায়, সর্ব্ববিধ শিক্ষা প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা হইলে কোন্ ভাষায় শিক্ষাপ্রদান করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে কোন পৃথক্ বিচারের অবকাশ থাকে না। কিন্তু এ স্থলে আমরা নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে যেন কোন ক্রমেই বিস্মৃত না হই :—

(১) বর্ত্তমান ভারতের বিশিষ্ট অবস্থা।

(২) আমাদের দেশীয় ভাষার অপরিপুষ্ট অবস্থা (কারণ, গবর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণ কেহই ভাষা-সমস্যার প্রতি আজি পর্য্যন্ত তাদৃশ মনোযোগ করেন নাই)।

"ইহা দ্বারা এই লাভ হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে দেশীয় ভাষার সাহায্যেই কেবল সর্ব্ববিধ শিক্ষার, বিশেষতঃ উচ্চ-শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় না। সুতরাং সমস্যাটী তিন ভাগে বিভক্ত হইতেছে :—

(১) দেশীয় ভাষাগুলিকে সর্ব্ববিধ শিক্ষার 'বাহন'-স্বরূপ করিতে হইলে, ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য কি ?

(২) দেশীয় ভাষাগুলির বর্ত্তমান অবস্থায় (যাহাকে আমি অতঃপর মধ্যযুগ বলিয়া অভিহিত করিব) আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর কি প্রকার পরিবর্ত্তন আবশ্যক, যাহার দ্বারা একদিন আমাদের চরম লক্ষ্যস্থল যে মাতৃভাষার সাহায্যেই সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা প্রদান করা, তাহা সংঘটিত হইতে পারিবে ?

(৩) দেশীয় ভাষাগুলি পরিপুষ্ট ও উন্নত হইয়া যাহাতে উচ্চ শিক্ষার বাহন হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কি কি ব্যবস্থা করা আবশ্যক ?

"এই সকল অবস্থার প্রতিবিধান করিবার জন্য আমি প্রস্তাব করি, আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কার সম্বন্ধে যে নূতন আইন হইবে, তাহার মধ্যে ইহা যেন স্পষ্টরূপে বিহিত হয় যে, অতঃপর বিশ কিংবা পঁচিশ বৎসরের পর হইতে, কি উচ্চ, কি প্রাথমিক, সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যেই প্রদান করা হইবে। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা সম্বন্ধে এই ঘোষণার ফলে আমাদের দেশে শিক্ষারাজ্যে একটী নবযুগের আবির্ভাব হইবে এবং আমাদের দেশে শিক্ষা-সংক্রান্ত বিচিত্র অবস্থার জন্য যে সকল জটিল ও দুরূহ সমস্যা ঘটিয়াছে, সেগুলির সমাধান সহজেই হইয়া যাইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর প্রভূত আনন্দ ও উচ্চ শিক্ষার প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে।"

যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মধ্যে আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের কর্ত্তব্য হইবে যে, যাহাতে এই অবান্তর কাল বৃথা নষ্ট না হয় এবং ঐ কালের মধ্যে তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ যাহাতে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যানুকূল হইয়া উঠে, তাহা সর্ব্বতোভাবে করা। যাহা যাহা করা উচিত বলিয়া বিবেচনা করি, তাহা আমি পূর্ব্বোক্ত কমিশনারগণের নিকটে বলিয়াছি—সেইগুলি সংপ্রতি আপনাদের নিকটে নিবেদন করিতেছি :—

(ক) ইউরোপীয় অথবা ভারতীয় সুপণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে যোগ্য শিক্ষক গড়িয়া তোলা, অর্থাৎ যিনি যে বিষয়ে শিক্ষকতা করিবেন, তাঁহার সেই বিষয়ে যাহাতে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় এবং যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের লব্ধজ্ঞান বাঙ্গালা ভাষায় ছাত্রগণের মধ্যে বিতরণ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা। এই কার্য্যের জন্য ইউনিভার্সিটি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যথোচিত সাহায্য লইয়া গ্রাজুয়েট-গণকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রথম শ্রেণীর সুযোগ্য পণ্ডিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করুন। এই প্রকারে যে সকল গ্রাজুয়েট ব্রতী হইবেন, তাঁহাদিগকে স্পষ্টভাবে এই কথা ইউনিভারসিটি বুঝাইয়া দিন যে, তাঁহারা যে যে বিষয়ে এইভাবে অধ্যয়ন করিবেন, সেই সেই বিষয়ে বঙ্গভাষায় বক্তৃতাদান এবং মৌলিক পুস্তক রচনা করিতে বাধ্য থাকিবেন। এই নীতি অবলম্বন করিলে আমাদের বঙ্গভাষায় শিক্ষোপযোগী নানাবিধ উচ্চ, উচ্চ বিষয়ে

সৎ-সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে। এই প্রকার সৎ-সাহিত্য ব্যতীত ছাত্রগণের মাতৃভাষায় উচ্চ শিক্ষালাভের আশা অসম্ভব। যে Research প্রোফেসারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধুনা অনেকে অনেক কথা বলিতেছেন ও লিখিতেছেন, সেই প্রকার Research Professor এই সকল পণ্ডিতগণের মধ্য হইতে বাছিয়া লওয়া চলিবে।

(খ) বঙ্গভাষায় শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে Extension Lecture প্রদান করিবার বন্দোবস্ত ইউনিভার্সিটি করুন। যে সমস্ত উপযুক্ত গ্রাজুয়েট এখন পাওয়া যায় এবং উপরোক্ত (ক) বিধানানুসারে যাঁহারা সুশিক্ষিত হইবেন, তাঁহাদের দ্বারা বাঙ্গালা-ভাষায় নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়াইবার বন্দোবস্ত করা হউক। বিষয়গুলি এই :—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান (Mental and Moral Science) ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র (Economics), অঙ্কশাস্ত্র, জড়বিজ্ঞান (Material Science) এবং কলাবিদ্যা (Technology)। এই প্রথায় কার্য্য চলিলে উচ্চ শিক্ষা জনপ্রিয় হইবে এবং উচ্চজ্ঞানের পরিপুষ্টি ও উন্নতির পক্ষে প্রচুর সহায়তা করিবে, অথচ সেই সঙ্গে উচ্চ উচ্চ বিষয়ে সুন্দর সুন্দর পাঠ্য পুস্তক-রচনা করিবারও সুবিধা ঘটিবে। কোনও ভাষার সাহায্যে কিছুকাল যাবৎ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ভাবের আদান প্রদান না চলিলে এবং পঠন-পাঠনাদি না ঘটিলে, সেই ভাষায় কোনরূপ উৎকৃষ্ট পাঠ্য-পুস্তক রচিত হইতে পারে না। ইহাই ভাষার পরিপুষ্টি-সাধনের একমাত্র প্রকৃষ্ট

উপায়। যে ভাষায় এবং যে বিষয়ে পুস্তক রচনা করিতে হইবে, কেবল সেই ভাষাবিৎ এবং সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে নিয়োজিত করিলেই সুন্দর পাঠ্য পুস্তক রচিত হইতে পারে না।

(গ) বর্ত্তমান প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেও আমাদের কলেজের অধ্যাপকগণকে বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা করিবার জন্য এবং ছাত্রগণকে বাঙ্গালা ভাষায় প্রশ্নোত্তর লিখিবার জন্য অনুমতি প্রদান করা হউক। এই ব্যবস্থা আমাদের অধ্যাপকগণের নিকটে নিতান্ত নূতন বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কারণ, আমি জানি, অনেক যোগ্য অধ্যাপক বর্ত্তমানেও ঐরূপ ভাবে অবিধি-পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। কতকগুলি বিষয় আছে, যেমন ইতিহাস, সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি, যেগুলির অধ্যাপনা উচ্চ শিক্ষার কোনও ক্ষতি না করিয়া, এখনই বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে চলিতে পারে এবং যাহার বিষয়ে ছাত্রেরা বাঙ্গালাভাষায় উত্তর লিখিতে পারে। যত দিন না ইউরোপীয় ইতিহাস পড়াইবার জন্য যোগ্য বাঙ্গালী অধ্যাপক পাওয়া যাইতেছে, তত দিন ইতিহাস শিক্ষা-কল্পে এ দেশে কিছুকালের জন্য ইংরাজী গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ ও ইউরোপীয় অধ্যাপক নিয়োজন করিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় কি কি বিষয়ের শিক্ষাদান ও পরীক্ষা-কার্য্য চলিবে, তাহা স্থির করিবার ক্ষমতা আপাততঃ আমাদের ইউনিভার্সিটির হস্তে থাকা প্রয়োজন। ইহা আমার পক্ষে বলা বাহুল্য যে, ইউনিভার্সিটি উক্ত বিষয়ে ক্ষমতা পরিচালন করিবার সময়

নিম্ন-লিখিত দুইটী মূল উদ্দেশ্য যেন সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করেন ঃ—

(১) যেন অকালে বাঙ্গালাভাষার অধ্যাপনা এবং পরীক্ষার কার্য্য প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য উচ্চশিক্ষা কোন মতেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, এবং পক্ষান্তরে—

(২) বাঙ্গালা ভাষায় ছাত্রগণকে শিক্ষাদান এবং পরীক্ষা করিবার পথ যাহাতে সুগম হয়, তৎপ্রতি সাহায্য প্রদান ব্যতীত যেন কোন প্রকার অন্তরায় উপস্থিত না করা হয়। এই কারণে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাঙ্গালা ভাষাকে উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যবহার করিবার পক্ষে আমাদের অধ্যাপক এবং ছাত্রবৃন্দকে যেন ক্রম-বর্দ্ধনশীল-ভাবে অধিকার প্রদান করা হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিষয়ে বহু আলোচনার পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, সেইগুলি আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। এখানে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য যে, দেশপূজ্য, স্বর্গগত মাননীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সিদ্ধান্তগুলির খস্‌ড়া নিজে লিখিয়াছিলেন। সিদ্ধান্তগুলি এই ঃ—

"(১) শিক্ষাবিষয়ে বঙ্গভাষার উন্নতি ইংরাজী-শিক্ষার বাধাজনক হইতে পারে এবং যে সকল বিষয়ে উচ্চ-শিক্ষা ইংরাজীতে লাভ করা যাইতেছে ও যাইতে পারে, সে সকল শিক্ষা সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বাধা হইতে পারে, এ আশঙ্কা অমূলক।

(২) কি নিম্ন. কি উচ্চ, সকল প্রকার শিক্ষাই যত দূর সাধ্য শিক্ষার্থীর মাতৃভাষাতে দেওয়া উচিত। যত দূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইহা নিঃসন্দেহরূপে নির্দ্দেশ করা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত ইংরাজী সাহিত্য ভিন্ন আর সকল বিষয়েই বাঙ্গালা ভাষাতে আবশ্যক গ্রন্থের কোন অভাব নাই এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর ভাষা-বিভ্রাটের আর কোন আশঙ্কা নাই। মধ্য (Intermediate) পরীক্ষাতে অধিকাংশ বিষয়েরই আবশ্যক গ্রন্থের অভাব নাই। আর যে যে বিষয়ের গ্রন্থের অভাব আছে, তত্তদ্বিষয়ের গ্রন্থের অভাব অতি সহজেই পূরণ হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সম্পূর্ণ বাঞ্ছনীয় এবং সে বাঞ্ছা পূর্ণ হইবার কোনও বাধা দেখা যায় না যে, বি এ, এম এ পরীক্ষার বিষয়ও একদিন বাঙ্গালা ভাষাতে বাঙ্গালী শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। দুই বৎসর পরে হউক, আর পাঁচ বৎসর পরে হউক, বাঙ্গালা ভাষাতেই সমস্ত উচ্চশিক্ষার বিষয় অধীত হইবে—এই ঘোষণা কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক একবার প্রচারিত হইলে অল্প দিনের মধ্যেই সুযোগ্য গ্রন্থকারের লিখিত নানা বিষয়ে সদ্‌গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে রচিত হইবে।

(৩) আর একটী বিষয়ে বক্তব্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা কেবল রচনা শিক্ষার জন্য এক্ষণে পঠিত হয়। সে নিয়মের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য উভয়ই পঠিত হয় ও উভয় বিষয়েই পরীক্ষা হয়, ইহা প্রয়োজনীয়।

(৪) এম এ পরীক্ষাতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য, বঙ্গভাষা-তত্ত্ব এবং বঙ্গ-সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি পরীক্ষার বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৫) বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি দ্বারা উচ্চশিক্ষা বিস্তারোপযোগী বক্তৃতা বঙ্গভাষায় প্রদানের প্রথা যাহ'তে আরও অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করে, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমার শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ মনস্বী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ কি বলিয়াছেন, শুনুন,—"আমাদের দেশে শিক্ষা কেন বন্ধ্যা হইতেছে, শিক্ষিতও কেন পঙ্গু হইতেছে? ইহার প্রধান ও প্রথম কারণ, বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন না করিয়া বিদেশী ভাষার দ্বারা শিক্ষাদান। এইরূপ পৃথিবীর আর কোন দেশে আছে বলিয়া শোনা যায় নাই। আর কোথাও কখনও ছিল কি না, তাহাও জানা যায় নাই।" আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, গত University Commission শিক্ষা সম্বন্ধে এই দেশে যে একটী প্রকাণ্ড বিভ্রাট ঘটিতেছে, তাহার একটী সুমীমাংসা করিবেন। আশা করার বিশিষ্ট হেতুও ছিল। কারণ, আমরা জানি, আপনারা সকলেই জানেন যে, মাননীয় সরস্বতী মহাশয় একজন অদ্বিতীয় শক্তিমান্ পুরুষ এবং তিনি প্রাগুক্ত University Commission এর একজন বিশেষভাবে প্রতাপশালী সদস্য ছিলেন। কিন্তু অতীব দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ঐ Commission যে Report লিখিয়াছেন,

তাহাতে বর্ত্তমান শিক্ষা-বিভ্রাটের কোন মীমাংসাই হয় নাই সুতরাং সাহিত্য-সম্মিলনের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি হইবার পূর্ব্বে সমস্ত প্রকার শিক্ষার বাহন যাহাতে অচিরে বঙ্গভাষাই হয়, তাহার জন্য দেশমধ্যে বিশেষভাবে আন্দোলন উপস্থিত করা। এই সম্মিলনে বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার অনেক মাতৃভাষানুরাগী কৃতী সন্তান উপস্থিত আছেন; তাঁহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, যাহাতে প্রত্যেক জেলায়—এমন কি, প্রত্যেক মহকুমায় এই আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহার সম্বন্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন, ইহা তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ। এই প্রকার দেশমধ্যে সর্ব্বত্র আন্দোলন উপস্থিত হইলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং আমাদের গবর্ণমেণ্ট ঐ বিষয়ে উদাসীন থাকিতে সাহসী হইবেন, তাহা সম্ভব পর নহে। চাই কেবল সকলকে বুঝান এবং সকলের মন্তব্য কেন্দ্রীভূত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা। শুনিতে পাই, দেশের শিক্ষা-বিভাগ এখন নাকি আমাদের দেশস্থ একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হইয়াছে। আরও আপনারা সকলে সে দিন আমাদের নূতন লাট বাহাদুরের মুখে শুনিয়াছেন যে, Transferred Department সম্পর্কে দেশীয় প্রজাদের প্রতিনিধি-স্বরূপ কৌন্সিলই সর্ব্বময় কর্ত্তা। ঐ সকল বিষয়ে Parliament কিংবা Government of India, ইহাঁদের কোনও আধিপত্য নাই। শিক্ষা-বিভাগ সম্বন্ধে সমস্ত কর্ত্তৃত্বই কৌন্সিলের উপর বিন্যস্ত

হইয়াছে এবং ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় কৌন্সিলের নিকটই সর্ব্ব-প্রকারে দায়ী। এই বার দেখা যাইবে, এই কথাগুলির মধ্যে বাস্তব কিছু আছে কি না? বঙ্গবাণীকে অচিরে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার বাহন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত আইনে স্পষ্টরূপে বিঘোষিত হওয়া উচিত যে, অতঃপর বিশ কিংবা পঁচিশ বৎসরের মধ্যে কি উচ্চ, কি প্রাথমিক, সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যেই প্রদান করা হইবে। শিক্ষা সম্বন্ধীয় এই ঘোষণার ফলে আমাদের দেশে শিক্ষারাজ্যে একটী নবযুগের আবির্ভাব হইবে। আমাদের এবং আপনাদের সকলেরই ঈপ্সিত এবং প্রার্থিত এই কল্পনা বাস্তব করিতে হইলে কর্ত্তৃপক্ষগণের যাহা কর্ত্তব্য, তাহার কতক ইঙ্গিত ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি; কিন্তু এতৎসম্পর্কে আমাদের অর্থাৎ বঙ্গবাসী মাত্রেরই কিছু কিছু কর্ত্তব্য আছে। তাহা একটু বিস্তৃতভাবে বলিব, ইচ্ছা করিতেছি। উহা বলিবার পূর্ব্বে এত দিন যে যে বিষয়ে আমাদের স্বদেশবাসীরা সম্পূর্ণ মনোযোগ করেন নাই, তৎপ্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া, তারপর বর্ত্তমান কর্ত্তব্য কি কি, তাহার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য জানাইয়া আমার এই অভিভাষণ সমাপ্ত করিব।

দেশীয় ভাষা, এমন কি, দেশীয় বিদ্যার প্রতি এই দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কি প্রকার যত্ন ছিল, তাহার সম্বন্ধে দুই একটী কথা এখানে না বলিয়াই পারিতেছি না। আপনারা জানেন, লর্ড রোণাল্ড্‌সে বলিয়াছেনঃ—"It is Western Philosphy only

that is taught. And it is only those who proceed with their studies beyond the B. A. degree who receive at the hands of their University draught from those springs of profound philosophic thoughts which have welled up in such rich measure from the intellectual soil of their own country Frankly, that strikes me as a stupendous anomaly." "That an Indian student should pass through a course of philosophy at an Indian University without hearing some mention of, shall I say, Sankara, the thinker who perhaps has carried idealism farther than any other thinker of any other age or country, or of the subtleties of the Nyaya System which has been handed down through immemorial ages and is to-day the pride and glory of the *Tols* of Navadwipa, does appear to me to be a profound anomaly."

কিন্তু লর্ড রোণাল্ড্‌সে বোধ হয় জানিতেন না যে, M. A. পরীক্ষায় বর্ত্তমান কালে ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের বিন্দুমাত্র যে অধীত হইতেছে, তাহাও অতি অল্প দিন হইতে প্রচলিত হইয়াছে। আমি যখন সেনেটে প্রথম প্রবেশ করি, তখন দেখি যে, সেই সময় পর্য্যন্ত কোনও পরীক্ষায় ভারতীয় দর্শনের ছিটা-

ফোঁটাও ছিল না। বহু চেষ্টা এবং বহু বাদ-প্রতিবাদের পর যখন ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের কোন কোন অংশ M. A. পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইল, তখন যেন ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রাদি সমন্বয় করিয়া জাতিতে উঠিল। কিছু দিন পূর্ব্বে এই প্রকার অবস্থা সত্ত্বেও শুনিয়াছিলাম যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক কর্ত্তৃপক্ষ, জাপান অঞ্চলে দর্শনশাস্ত্রের গবেষণা করার জন্য সুধী প্রেরণ করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে নিজেদের কৃতিত্বের কথা সাহঙ্কারে প্রকাশ করিতেছেন। এই প্রকার প্রমাদ কেবল এই দেশেই সম্ভব-পর। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃ-পক্ষগণ এত দিন ভারতীয় দর্শনাদি এবং ন্যায়শাস্ত্রাদিকে উপেক্ষার চক্ষে না দেখিতেন, তাহা হইলে কি এত দিনের মধ্যে উহার রীতি-মত পঠন পাঠন হইয়া কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক একখানিও রচিত হইত না? দেশে কিছুই নাই, দেশের সমস্তই খারাপ—এমন কি, জীবন-চরিত পড়িতে হইলেও ডুবাল চরিত, ভামস ইস্কলচরিত পড়িতে হইবে, দেশীয় কোন মহাপুরুষের জীবন-চরিত পাঠ করা নিষ্ফল, এই প্রকার যে একটী প্রকাণ্ড ধারণা এই দেশের লোকের মনে দৃঢ়রূপে ছিল, তাহার কারণ আর কিছুই নহে—কেবল আমাদের মানসিক সম্যক্ অবনতি, যাহাকে ইংরাজী ভাষায় বলা চলে—slavish and degraded mentality. শ্রীভগবানের কৃপায় দেশের এই তমসাচ্ছন্ন ভাব দূর হইতেছে। এত দিন এই প্রকার পুস্তকাদি রচিত হয় নাই, ইহা

আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

আমাদের মাতৃভাষাকে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার "বাহন" করিতে হইলে উহাকে সর্ব্বাগ্রে ভাব-সম্পদে এবং জ্ঞান-সম্পদে মহীয়সী করিতে হইবে। তাহা না হইলে দেশে প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার ঘটিবে না। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ভাষা, জ্ঞান-প্রচারের সাধনমাত্র, সাধ্য হইতেছে—প্রকৃত জ্ঞান-অর্জ্জন ও তাহার বিস্তার। যে ভাষার সাহায্যে জ্ঞান বিস্তার করিব, সেই ভাষা যদি শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রাচুর্য্যের অভাবে এবং ভাব-সম্পদে দরিদ্র হয়, তাহা হইলে সেই ভাষার দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান-বিস্তারের চেষ্টা বৃথা। কিন্তু ভাষার ভাণ্ডার জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা সেই ভাষাভাষীদের চেষ্টার উপরেই নির্ভর করে। শিক্ষিত বঙ্গবাসী যদি সেই চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে মাতৃভাষার নিকটে এবং স্বদেশের নিকটে তিনি গুরুতর অপরাধী। যাঁহারা ঐ প্রকার চেষ্টা আদৌ না করেন, তাঁহাদিগকে আমি নিম্ন-লিখিত ব্যক্তির সহিত সমান দোষী বলিয়া মনে করি। মনে করুন, আমাদের মধ্যে যদি কেহ বিদ্যাবলে কিংবা বুদ্ধিবলে বিদেশে গিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে থাকেন এবং সেই অর্থ কেবল বিদেশেই ব্যয় করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাহাতে দেশের কোনও লোকেরই উপকারে আইসে না। এই প্রকার লোকের দ্বারা আমাদের দেশের, আমাদের সমাজের যদি কোন উপকার সাধিত না হয়, তবে তিনি

যে আমাদের একজন, এ কথা ভাবিবার আমাদের কি থাকে এবং মনুষ্যত্ব হিসাবে তিনি স্বদেশবাসীদের নিকট কর্ত্তব্য পালন না করার হেতু অবশ্য নিন্দনীয় হয়েন। সেই প্রকার, যে বঙ্গবাসী ইংরাজী প্রভৃতি ভাষা, এমন কি, সংস্কৃত ও আরবী, পার্শী ভাষাতে ব্যুৎপন্ন হইয়া যদি তাঁহার অধীত বিদ্যাপ্রচার ও প্রকাশকল্পে কেবল ইংরাজী প্রভৃতি ভাষারই আশ্রয় লয়েন, মাতৃভাষার দিক্ দিয়াও না চলেন, তাহা হইলে তাঁহার বিদ্যায় আমার দেশের লোকের কি কাজ হইল? তাঁহার নাম নানা স্থানে বিঘোষিত হইয়া, তাঁহার অহঙ্কার-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে বটে, কিন্তু দেশের লোকের তিনি বড় একটা কোন কাজেই আসেন না। যে শিক্ষিত লোক এই ভাবে চলেন, তিনি অবশ্যই নিন্দনীয়—মনে হয়। বিশেষতঃ মাতৃ-ভাষার ভাব-সম্পদে অপেক্ষাকৃত দরিদ্রতার দিনে তাঁহার ঐ প্রকার অপরাধের মাত্রা কিছু অধিকই হইয়া থাকে, ইহা সুধীগণ অবশ্যই বুঝিবেন। তাই আমি অনুরোধ করি এবং শিক্ষিত বঙ্গবাসীর নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করি, তাঁহারা যেন অতঃপর মাতৃভাষার প্রতি বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া, মাতৃ-ভাষার অভাব পূরণ করেন এবং দরিদ্রতা মোচন করেন। মাতৃভাষার ভাবসম্পৎ বৃদ্ধি করিতে হইলে যাহা যাহা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করি, তাহা নিম্নে ধারাবাহিক-রূপে আপনাদের নিকট নিবেদন করিতেছি,—

(১) বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষায় লিখিত ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যার নানা

বিষয়-সংক্রান্ত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করান। এই অনুবাদ-কার্য্যটী যেমন কঠিন, তেমনই প্রয়োজনীয়। যিনি যেগ্রন্থের অনুবাদ করিবেন, তাঁহাকে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ে এবং গ্রন্থের ভাষায় সুপাণ্ডিত হইতে হইবে—নচেৎ অনুবাদ ব্যর্থ হইবেই। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ব্যতীত অন্য লোকের কৃত অনুবাদ যে কি প্রকার ভয়াবহ এবং স্থানে স্থানে হাস্যজনক, এ দেশে সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি এবং গ্রন্থের ভাষায় সম্যক্ অধিকার থাকিলেও যে সর্ব্বত্র অনুবাদের কাজ সুষ্ঠুরূপে ঘটে, তাহাও বলিতে পারি না। কারণ, যিনি অনুবাদ করিবেন, তাঁহারও ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উপযুক্ত ক্ষমতা এবং সৌকর্য্য থাকা আবশ্যক। আপনারা অনেকেই জানেন যে, বর্ত্তমানে অনেক অনূদিত গ্রন্থ অনুবাদ-পাঠে নিতান্ত দুর্ব্বোধ বলিয়া বোধ হয়, এবং সেই সেই গ্রন্থের মূল আলোচনা না করিলে প্রকৃত অর্থ নিষ্কাশন করা সহজ হয় না। ইহাই যদি হইল, তবে অনুবাদ করিয়া লাভ কি? উহাতে ত প্রকৃত প্রস্তাবে মাতৃভাষার ভাবসম্পৎ বৃদ্ধি হইল না। আমি এমন কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ দেখিয়াছি, যাহা পাঠে বোধ হইয়াছে যে, এক শ্রেণীর লোকেরা কেবল বিভক্তিগুলি পরিবর্ত্তন করিয়া মূল গ্রন্থের অবলম্বিত পদরাশিই অনুবাদে নিবিষ্ট করেন। ইহা একটা কিম্ভূত-কিমাকার দুর্ব্বোধার্থক বাক্যাবলীর সমাবেশ মাত্র। অন্য এক শ্রেণীর লোকেরা, ভাব প্রকাশের সৌকর্য্যের

অভাববশতঃ এমন একটা অনুবাদ খাড়া করেন, যাহার অর্থ যে মাথা-মুণ্ড কি—তাহা অনুবাদক ব্যতীত অন্য কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। সচরাচর অনুবাদ দুর্ব্বোধ হইয়া যে ব্যর্থ হয়, তাহার অনেকগুলি কারণ আছে।

সার্থক অনুবাদ করিবার ক্ষমতা বহু সাধনা-সাপেক্ষ। এই প্রকার সাধনার ব্যবস্থা এবং সার্থক অনুবাদ করাইবার কোনও অনুষ্ঠান নাই—উহার জন্য বিশেষ চেষ্টার আবশ্যক। ভাষান্তরে লিখিত গ্রন্থ অনুবাদ করিতে করিতে ভাব প্রকাশের ক্ষমতা স্বতঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং কোনও ভাষার ভাব-সম্পদ্-রহিত অবস্থায় উহার উৎকর্ষ-বিধানের জন্য অনুবাদ করান একটী সর্ব্বপ্রধান উপায়। অনুবাদ করিতে করিতে কেমন করিয়া নিজেদের ভাষাতেও ভাব-প্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং উহাতে সৌকর্য্য ঘটে, তৎসম্বন্ধে একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার কি লিখিয়াছেন, শ্রবণ করুন,—

By rendering ourselves the faithful interpreters of the thoughts and feelings of others, we are rewarded with the acquisition of greater readiness and facility in correctly expressing owr own ; as he, who has best learnt to execute the orders of a commander, becomes himself best qualified to command."

এই প্রকার অনুবাদ-কার্য্যের দ্বারা আমাদের মাতৃভাষার

যে কত প্রকারে ভাব-সম্পৎ বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। এক দিকে যেমন ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের দুই সর্ব্বপ্রধান জাতির, অর্থাৎ হিন্দু এবং মুসলমান জাতির, প্রাচীন সাহিত্য-গর্ভে নিহিত নানা প্রকার তত্ত্বকথা আমাদের বঙ্গভাষাভাষী সর্ব্বসাধারণের গোচরে আসিবে, অন্য দিকে তেমনই বর্ত্তমান ইউরোপীয়দিগের উদ্ভাবিত নূতন বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের নানা রহস্য আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবে। ভাব-সম্পৎ এবং জ্ঞান-ভাণ্ডার এই উপায়েই অনেক পরিমাণে পুষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই প্রকারে প্রাচীন সাহিত্যের অনুবাদ হইলে, পরস্পরের জাতীয় মহত্ব প্রকাশিত হইয়া পরস্পরের মনোমালিন্য অধিক পরিমাণে দূর হইবে। হিন্দুমুসলমান-বিদ্বেষ উপলক্ষে কোন কথা উঠিলেই আমি আমার মুসলমান বন্ধুদের বলিয়া থাকি যে, এই বিদ্বেষ-বহ্নি নির্ব্বাপন করার চেষ্টা সম্বন্ধে তাঁহারাও কম উদাসীন নহেন। Racial antipathy অর্থাৎ জাতিগত বিদ্বেষ কতকটা অজ্ঞ মানবমাত্রেরই স্বাভাবিক ; কিন্তু যদি পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন জাতির মহত্ব পরস্পরের নিকট অপ্রকাশ না থাকিয়া প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে বিদ্বেষভাব থাকিবার অবকাশ একেবারেই হয় না। এতৎসম্বন্ধে আমি একটী ক্ষুদ্র উদাহরণ দিব। আমি একজন হিন্দু-সমাজভুক্ত ব্যক্তি এবং নিজেকে আনুষ্ঠানিক হিন্দু বলিয়া গৌরব করিতে কুণ্ঠিত নহি। প্রাচীন আর্য্যদের আদর্শের আমি একজন একান্ত ভক্ত ; কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ও মূল সূত্র এবং মুসলমান

ভক্তগণের জীবন-চরিত যাহা পাঠ করিয়াছি, তাহাতে অনেক সময়ে মনে মনে অনুভব করিয়াছি যে, মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ-ভাব হওয়া ত দূরে থাকুক,—যদি নিজে প্রকৃত মুসলমান হইতে পারিতাম, তাহা হইলে নিজেকে ধন্য এবং কৃতকৃতার্থ বোধ করিতাম। বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমান-বিদ্বেষ আর প্রায় নাই বলিলেও হয়; শ্রীভগবানের নিকট কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন তিনি এই ভাব চিরস্থায়ী করেন। কিন্তু কেবল প্রার্থনায় শ্রীভগবান্ যে সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা বোধ হয় না। আমাদের সকলেরই, বিশেষতঃ এ দেশবাসী শিক্ষিত মুসলমান মাত্রেরই কর্ত্তব্য যে, তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল অমূল্য উপদেশ আছে এবং তাঁহাদের মহাপুরুষদের জীবনে যে সকল ঈশ্বর-বিশ্বাসের এবং ভগবদ্ভক্তির কথা মূর্ত্তিমদ্-রূপে বিরাজিত আছে, তাহা তাঁহারা বঙ্গভাষায় প্রচারিত করিয়া দেশ-ব্যাপী কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করুন। অচিরে দেখিবেন যে, আমাদের মধ্যে ভাবগত ঐক্য সাধন অতি সহজ ব্যাপার হইয়া উঠিবে।

(২) উপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা নানা শাস্ত্র সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করান। প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গভাষায় উচ্চ উচ্চ বিষয়ে কোনও গ্রন্থ নাই—এ অবস্থায় বঙ্গ-ভাষায় উচ্চশিক্ষার বিধানকল্পে চেষ্টা করা বাতুলতার কার্য্য। হইতে পারে সর্ব্ববিষয়ে সকল প্রকার উচ্চ শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ বর্ত্তমানে নাই; কিন্তু সেটা কাহার দোষে ঘটিতেছে? বঙ্গভাষা

ভাষার মধ্যেই নহে, উহা কখনও উচ্চশিক্ষার—এমন কি, মাধ্যমিক শিক্ষারও উপযুক্ত নহে বা হইতে পারে না—এই প্রকার কুসংস্কারের ফলস্বরূপ জড়তা-নিবন্ধন কি উহা ঘটে নাই? নিশ্চয়ই ঐ জড়তাবশতঃই আজও পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার ঐ প্রকার অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। ইহার জন্য বরং আমাদের লজ্জিত হইয়া, উহার নিরাকরণ উদ্দেশ্যে দ্বিগুণ উৎসাহে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। উপযুক্ত গ্রন্থাদি রচিত না হইলে বঙ্গভাষাকে শিক্ষার "বাহন" করিব না—এই ভাবে যদি অমারা মুগ্ধ থাকি, তাহা হইলে বঙ্গভাষার দরিদ্রতা এবং অসম্পূর্ণতা কখনই দূর হইবে না। জলে না নামিলে যেমন সাঁতার শিক্ষা করা যায় না, তেমনই বঙ্গভাষায় শিক্ষা প্রচলনের উদ্দেশ্য স্থির করিয়া, তৎপক্ষে চেষ্টা করিতে কৃতসংকল্প না হইলে, কখনই বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মৌলিক গ্রন্থ রচিত হইতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষায় পঠন-পাঠন আরম্ভ হইবে—বিঘোষিত হউক, তৎক্ষণাৎ দেখিবেন যে, উপযুক্ত গ্রন্থ লেখার দিকে শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঝোঁক অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে এবং অবান্তর কালে শিক্ষা প্রদান সম্বন্ধে যে ব্যবস্থার কথা ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তাহা আরম্ভ হইলে দেখিবেন যে, সর্ব্ববিষয়ে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইতে আরম্ভ হইবে এবং দিন দিন বঙ্গভাষা সর্ব্বপ্রকার ভাব এবং সর্ব্বপ্রকার প্রতিপাদ্য বিষয়ই প্রকাশের অনুকূল হইয়া বঙ্গবাণী সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় হইবে। নূতন নূতন বিষয়ে গ্রন্থাদি রচনাকালে অনেক পরিভাষা এবং অনেক নূতন

শব্দ সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যক। আপাততঃ ঐ সকল কার্য্য যে ভাবে হইতেছে, তাহাতে বিশেষ কোনও শৃঙ্খলা দেখা যায় না। যিনি যেমন মনে করিতেছেন, তেমনই একটা না একটা শব্দ সৃষ্টি করিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। শাস্ত্রবিশেষের পরিভাষা সৃষ্টি, শাস্ত্রে প্রতিপাদ্য বিষয়ের বহু আলোচনা এবং পঠন-পাঠন আদি দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের ভাব-বিনিময়ের উপরে সম্পূর্ণ না হইলেও অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। পরিভাষা সৃষ্টি আজ্ঞাসিদ্ধ নহে। এই সম্বন্ধে আমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বহু চেষ্টা করিয়াছেন—সর্ব্বদা যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না; ইহা পরিষদের চেষ্টার অভাবে ঘটে নাই; দেশমধ্যে ঐ ঐ প্রতিপাদ্য বিষয়ে শিক্ষিতদের মধ্যে বঙ্গভাষায় আলোচনার একান্তাভাব না হইলেও অত্যন্তাভাব এবং ঐ ঐ প্রতিপাদ্য বিষয়ে বঙ্গভাষার পঠন-পাঠন প্রচলিত না থাকাতেই পরিষদের চেষ্টা সর্ব্বথা সিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষবর্গের উদাসীনতাই এ স্থলে প্রধান কারণ। অতঃপর তাহা যাহাতে আর না থাকিতে পারে, আপনারা সকলে সমবেত চেষ্টার দ্বারা তাহা করুন। পরিভাষ সৃষ্টি এবং নূতন শব্দ সৃষ্টি করিতে হইলে যে সকল নিয়ম অবশ্য প্রতিপাল্য, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গের কথা শেষ করিব। মনস্বী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ কি বলিতেছেন, তাহা আপনাদের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—"যত দিন না বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য দর্শনের পঠন-পাঠন প্রবর্ত্তিত

হইবে, তত দিন প্রকৃত দার্শনিক পরিভাষা সঙ্কলিত হইবার সম্ভাবনা অল্প। সজীব দর্শন-চর্চ্চা দেশমধ্যে প্রচলিত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন লেখক একই দার্শনিক তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন পরিভাষার প্রয়োগ করিবেন। সেই সকলের মধ্যে যাহা যোগ্যতম, তাহাই টিকিয়া যাইবে।" হীরেন্দ্র বাবু দার্শনিক পরিভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন—তাহা সর্ব্বশাস্ত্রের পরিভাষা সঙ্কলন সম্বন্ধে প্রযোজ্য। আর একটি কথা আমি না বলিয়াই পারিতেছি না। বর্ত্তমানে দেখিতে পাই যে, কোন পরিভাষা সঙ্কলনের আবশ্যকতা ঘটিলে এবং নূতন শব্দ সৃষ্টির প্রয়োজন হইলে, বিনা অনুসন্ধানেই একটা না একটা আপাততঃ কার্য্যোপযোগী অর্থবোধক শব্দ আমরা অনেকেই সৃষ্টি করিয়া থাকি। অনেক সময়ে ঐ ঐ বিষয়ে কোন শব্দ বা কোন পরিভাষা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে আছে কি না, তাহা জানিবার ধৈর্য্যটুকুও আমাদের থাকে না। এই বিষয়ে আমাদের কতকটা সংযম অভ্যাস করা এবং নিপুণতা সহকারে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, প্রাচীন সাহিত্যের গবেষণা অবলম্বন করা অতীব কর্ত্তব্য। যে দেশের দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে স্বর্গীয় ডাক্তার ডফ্ সাহেবকেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, "ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে এমন কিছু নূতন কথা নাই, যাহা ভারতবর্ষীয় দার্শনিকেরা জানেন না। সুতরাং ভারতবর্ষে ইউরোপীয় দর্শন প্রচারের চেষ্টা করা বৃথা।" শুনিয়াছি, একদিন একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত যুবকের মুখে Kant, Hegel

প্রভৃতি দার্শনিকগণের অজস্র প্রশংসাবাদ শুনিয়া বারাণসী-ধামে Dr. Venis, মহামহোপাধ্যায় ৺কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের শরীর দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, "রাখ তোমার Kant, Hegel,—ঐ যে প্রাচীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখিতেছ, উঁহার একখানি ক্ষীণ পঞ্জরের মধ্যে যে দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহার শতাংশের একাংশও সমগ্র ইউরোপের দার্শনিক-গণের মধ্যে নাই।" এই অবস্থায় দার্শনিক প্রতিশব্দ এবং পরিভাষা সঙ্কলন সম্বন্ধে এ দেশে যে কোনও চিন্তার কারণ আছে, তাহা নাই; উহা অতি সহজেই সঙ্কলিত হইতে পারিবে। চাই কেবল আমাদের প্রেরণা আর সংস্কৃত ভাষাজ্ঞ দার্শনিক-বর্গের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সংস্কৃত এবং পালিভাষায় লিখিত ও ব্যবহৃত দার্শনিক শব্দের সূচী প্রস্তুত করা। উহা কম আয়াস ও ব্যয়সাধ্য নহে; সুতরাং উহারও ব্যবস্থা হওয়া উচিত। যিনি যখন কোনও নূতন শব্দ সৃষ্টি করিবেন, তাঁহার প্রতি আমার নিবেদন এই—তিনি যেন হঠকারিতার সহিত একটী শব্দ সৃষ্টি করিয়া, সাহিত্যমধ্যে গণ্ডগোল উপস্থিত না করেন। তাঁহাকে বিশেষ নিপুণভাবে পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে, কি ভাবে শব্দ সৃষ্টি করিলে বঙ্গভাষার সহিত উহা ঠিক খাপ খাইবে এবং অকারণ বৃথা শব্দ সৃষ্টি করিয়া ভাষার বোঝার বৃদ্ধি করা না হয়। এই সম্বন্ধে একজন প্রবীণ গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আপনাদিগকে শুনাইতেছি ঃ—

"Some modern writers, howeuer, have in-

dulged in a habit of arbitrarily fabricating new words and a new-fangled phraseology without any necessity and with manfest injury to the purity of language. This vicious practice, the offspring of indolence or conceit, implies an ignorance or neglect of the riches in which the English language already abounds and which would have supplied them with words of recognised legitimacy, conveying precisely the same meaning as those they so recklessly eoin in the illegal mint of their own fancy."

এখানে গ্রন্থকার ইংরাজী ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, আমাদের বঙ্গ-ভাষা সম্বন্ধেও তাহা অধিকতর প্রযোজ্য; কারণ, তাহার পশ্চাতে সংস্কৃত, পালী ও প্রাকৃত ভাষার বিরাট সাহিত্য রহিয়াছে। উপযুক্ত ভাবে অনুবাদের কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত ও সুব্যবস্থিতরূপে চলিলে, ভাষায় অসম্পূর্ণতা আর থাকিবে না এবং গবেষণা করিয়া যাঁহারা মানবীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারে নূতন রত্নাদি উপহার দিবেন, তাঁহাদের নবাবিষ্কৃত বিষয়ের এবং নবাবিষ্কৃত তথ্যের কথা বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করা দুঃসাধ্য হইবে না।

বর্ত্তমান কালে আমাদের মাতৃভাষায় যাঁহারা উপন্যাস লিখিতেছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। ভরসা করি, এখানে তাহা উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

তাঁহারা যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেন, প্রায়শঃ সেইগুলি তজ্জাতীয় ইউরোপীয় সাহিত্যের আদর্শে রচিত হয়। উহাতে যে সকল প্রণয়কাহিনী দেখা যায়, তাহা বিদেশের আমদানি—আমাদের দেশের রীতি-প্রকৃতির সহিত যে উহা খাপ খায় না, এ কথা বোধ হয়, আমাদের উপন্যাস-লেখকগণও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। স্বদেশের রীতি ও প্রকৃতি এবং মানসিক প্রবৃত্তিগুলি সম্যক্‌ভাবে অনুশীলিত না হওয়ায় এবং দেশের প্রাচীন বিবরণাদির প্রতি যথোচিত আস্থা এবং আসক্তি না থাকায়, এই প্রকার কতকটা খাপছাড়া ভাবে যে দেশে উপন্যাসগ্রন্থ লিখিত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থ উদ্ধার এবং প্রাচীন বিবরণাদি সংগ্রহকল্পে নিম্নে যাহা বলিলাম, তাহা যদি কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে ঐ ভাবটা পরিবর্ত্তিত হইবে বলিয়া আশা করি। সংপ্রতি উপন্যাস-লেখক মহোদয়দের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যদি স্বদেশী এবং বিদেশী পুরাবৃত্ত অবলম্বন করিয়া, ঠিক ঠিক তদানীন্তন কালের উচিতমত ঘটনার সমাবেশ এবং মানবপ্রকৃতির ও সমাজের অবস্থাদি চিত্রিত করিয়া উপন্যাসাকারে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেন, তাহা হইলে বঙ্গীয় পাঠকবর্গের অশেষ উপকার সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। তাঁহারা এক উপন্যাস পড়িয়াই দেশ এবং বিদেশের ভিন্ন ভিন্ন কালের মানব-চরিত ও সমাজচরিত ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রস-সাহিত্য-পাঠের আনন্দ হইতেও বঞ্চিত হইবেন

না। আপনারা অনেকে জানেন যে, বর্ত্তমান ইউরোপে কিছু-কাল হইতে এই ধারায় উপন্যাসগ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ হওয়ায়, ঐ দেশের লোকেদের মধ্যে যাঁহারা নিজে বিশেষ কোন গবেষণা করেন নাই, তাঁহারাও প্রত্ন-তত্ত্ব-সংক্রান্ত অনেক কথা জানিতে পারিয়াছেন এবং ঐ প্রকার মিসর ও গ্রীস প্রভৃতি দেশের পুরাকালীন মানব-চরিত ও সামাজিক অবস্থা বিষয়ে জীবন্তভাবে অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। আমাদের দেশে পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এবং আমার শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ, বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে পথ দেখাইয়াছেন। আশা করি, ঐ পথ অনুসৃত হইয়া উপন্যাসগ্রন্থ লিখিত হইবে। আমাদের দেশে অশেষ প্রতিভাশালী উপন্যাস্-লেখকের অভাব নাই। তাঁহারা মনে করিলে বঙ্গভাষাতে ঐতি-হাসিক তথ্যপূর্ণ অথচ মানব-প্রকৃতির রহস্য-ব্যঞ্জক সুন্দর সুন্দর উপন্যাস গ্রন্থ লিখিয়া মাতৃভাষার প্রভূত উপকার এবং পাঠক-পাঠিকার জ্ঞান-সঞ্চয়ের পথ সুগম করিতে পারেন। আমি উপন্যাস খুব বেশী যে পড়িয়াছি, তাহা মনে হয় না; সুতরাং এক হিসাবে উপন্যাস গ্রন্থের রচনা সম্পর্কে আমার কোন কথা বলিতে যাওয়া একপ্রকার অনধিকার-চর্চ্চা। তথাপি কর্ত্তব্য-বোধে এখানে উপন্যাস রচনার একটা প্রধান দিক্ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিলাম, তাহার বিচার আপনারা করিবেন।

(৩) বঙ্গভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ-সকলের রীতিমত উদ্ধার এবং তাহার সদ্ব্যবহার। কিছু দিন হইল, স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যখন ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত লেখেন, তখন যে যে প্রাচীন গ্রন্থ জানা ছিল, তাহা অপেক্ষা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রযত্নে অনেক অজানিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার পর প্রাচ্য-বিদ্যা-মহার্ণব, মৌলবী আব্‌দুল করিম প্রভৃতি মহাত্মগণের এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অশেষ চেষ্টায়, বর্ত্তমানে অনেক প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, এবং অনেক পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। রীতিমতভাবে এই অনুসন্ধানের কাজ চলিলে, আরও অনেক লুপ্ত গ্রন্থরাশি যে আমাদের গোচরে আসিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আলমারি বোঝাই করিয়া রাখিলে চলিবে না। উহার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা আবশ্যক। বলিতে দুঃখ হয়, আমরা অদ্যাপি কাশীদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি বঙ্গভাষার মধ্যমণিস্বরূপ গ্রন্থের সুসংস্করণ বাহির করিতে পারি নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, দেশমধ্যে বিদ্যা-বুদ্ধিতে শীর্ষস্থানীয় মহোদয়গণের উপর ঐ ঐ গ্রন্থের সম্পাদন-ভার অর্পণ করিয়াছেন; কিন্তু তথাপি বাঙ্গালীর আশা অদ্যাপি পূর্ণ হয় নাই এবং ঐ সকল গ্রন্থকারদের পূত নামের এবং তাঁহাদের রচিত অমূল্য গ্রন্থরাজির প্রতি আমাদের যে যে কর্ত্তব্য

আছে, তাহা আমরা প্রতিপালন করিতে পারি নাই। বঙ্গবাসীর এই কর্ত্তব্যের ত্রুটি আর কত দিন থাকিবে? আপনারা সকলে মনোযোগী হউন; যাহাতে অচিরে প্রাচীন অমূল্য গ্রন্থগুলি বিশুদ্ধ পাঠসহ বাহির হয়, এবং বঙ্গবাসী পাঠক-পাঠিকার গোচরে আইসে, তাহা করুন। এই সকল গ্রন্থ রীতিমত আলোচিত হইলে, উহার দ্বারা আমাদের যে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। ঐ সকল গ্রন্থ সুসম্পাদিত এবং রীতিমত আলোচিত হইলে, উহা দ্বারা যে যে ফললাভ অবশ্য ঘটিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস, তৎসম্বন্ধে কয়েকটী কথা এখানে আপনাদের নিকট জ্ঞাপন করার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। আপনাদের হয় ত জানা কথা পুনরাবৃত্তি করিতেছি বলিয়া ক্ষমা করিবেন।

প্রাচীন গ্রন্থাদি মনোনিবেশ সহকারে পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে তদ্দারা তদানীন্তন কালের লোক-চরিত্র, সমাজ-বিন্যাস, ধর্ম্মবিশ্বাস, আহার-বিহারাদি দৈনন্দিন সামাজিক জীবন যাপনের বিধি-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় নীতি ইত্যাদি কত বিষয় যে আমাদের আয়ত্ত হইবে, তাহা অগ্রসূচী হইয়া বলা অসম্ভব। আমি যে যে বিষয়ের কথা বলিলাম, ঐ ঐ বিষয়ে আমাদের যে অশেষ প্রকারে জ্ঞান-বৃদ্ধি হইবে, তাহার পক্ষে ত বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; আমি আশা করি যে, পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি ব্যতীত অনেক নূতন নূতন তথ্য আমাদের মনে উদ্ভাসিত হইবে। সর্ব্বোপরি আমাদের দেশে কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, সমাজের ভিতরে যে একটী

বিদেশী ভাবের চমক আছে, তাহা বিদূরিত হইয়া প্রকৃত দেশের মর্ম্মস্থান কোথায়, তাহা আমাদের ভাল করিয়া বোধগম্য হইবে। দেশের ভাব-প্রবাহ কোন্-খাতে প্রবাহিত ছিল, এবং কি সূত্রে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া কি কারণে অন্য খাতে প্রবাহিত হইয়াছে এবং হইতেছে, এতৎসম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মিবে। ইহাতে যে কি লাভ, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য হইলেও সুধীবর্গের অনুভূতির অতীত নহে। দেশের অবস্থা সম্যক্ অবধারণ না করাতে, সহসা বিদেশী ভাবের এক প্রবল বন্যা আসিয়া আমাদের অনেকাংশে যে মন্দ হইয়াছে, তাহা এক্ষণে অনেকেই বুঝিয়াছেন। সুতরাং সেই বন্যার কথঞ্চিৎ গতিরোধ করিতে হইলে দেশকে খুব ভাল করিয়া চিনিতে হইবে। দেশকে ভাল করিয়া চিনিতে হইলে, দেশের প্রাচীন সাহিত্যের জ্ঞান লাভ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অতএব প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করা সর্ব্বাগ্রেই কর্ত্তব্য। তারপর আর এক প্রধান কথা প্রাচীন সাহিত্যাদি আলোচনার অবশ্যম্ভাবী ফল হইতেছে, ভাষার উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের ধারা নির্ণয় করা। এই ব্যাপারটী সংসাধিত করিতে হইলে আনুষঙ্গিকরূপেই এই দেশের অনেক পুরাতত্ত্ব এবং অনেক প্রকার সভ্যতা ও সাহিত্যের সহিত সংঘর্ষের কথা আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবে। আমি এখানে স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আমাদের সকলের পূজনীয় মাননীয় স্যর সরস্বতী মহাশয়ের মাতৃভাষানুরাগের ফলে বাঙ্গলা ভাষার অনেক তত্ত্ববিষয়ে কতকটা

গবেষণা হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সকলের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁহারই উদ্যোগে এই বিষয়ে আলোচনা ও অনুসন্ধান চলিতেছে, এবং কয়েকখানি সুন্দর সুন্দর পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থমধ্যে প্রবীণ গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু এখনও কাজ অনেক বাকি—এখও সমগ্র উপকরণের সংগ্রহ হয় নাই। দুঃখের বিষয়, প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্গত গ্রন্থাদি পড়িবার পক্ষে এক প্রকাণ্ড বাধা এখনও পর্য্যন্ত আছে। ঐ সকল গ্রন্থে ব্যবহৃত অনেক শব্দ বর্ত্তমানে প্রচলিত না থাকায় এবং উহাতে বর্ণিত স্থানাদির সংস্থান সম্যক্‌রূপে অবগত হইবার উপায় না থাকায়, ঐ গ্রন্থগুলি যে অনেক স্থলে কি প্রকার দুষ্পাঠ্য, তাহা অনেকে বোধ হয় অনুভব করিতে পারিবেন। ঐগুলির অর্থ পরিষ্কার করা এবং প্রাচীন সাহিত্য-বর্ণিত ভাবরাশি বুঝিবার পক্ষে অনেক অনুসন্ধান করা আবশ্যক ; বাড়ী বসিয়া অবসরক্রমে এবং আবশ্যকমত সংস্কৃত কোষাদির সাহায্যে উহার অর্থ নিষ্কাশন কিংবা ভাবরাশির সম্যক্ জ্ঞান-লাভ ঘটিতে পারে না। এই সকলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যদি সামান্যাকারে গ্রন্থের সম্পাদন করা হয়, তবে তাহা অন্ধকারে ঢিল মারার ন্যায় তদ্দারা উপকারের অপেক্ষা অপকারেরই সম্ভাবনা বেশী। আমি কিছু দিন পূর্ব্বে এই প্রকার সম্পাদিত একখানি প্রাচীন পুস্তক পাঠ করিয়া, সম্পাদনের রীতি দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। সম্পাদক

মহাশয় ঐ গ্রন্থের টীকায় প্রায়শঃ জানিত শব্দেরই অর্থ দিয়াছেন,তাহাও আবার অনেক স্থলে গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ অপেক্ষা অপ্রচলিত, এমন কি, দুরূহ শব্দের দ্বারা। কিন্তু যে সকল শব্দ বা ভাব বর্ত্তমান কালে আমাদের দুর্ব্বোধ্য, তাহার সম্বন্ধে তিনি কৃপা করিয়া কোন অর্থ ই প্রকাশ করেন নাই, এমন কি, বোধ হয়, সেই দিকে মাথা ঘামান তাঁহার সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনাও করেন নাই। সুতরাং প্রাচীন সাহিত্য প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যের একখানি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন অভিধান সঙ্কলন করা অতীব আবশ্যক। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করিয়া, তাহাতে নিবদ্ধ আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি এবং শব্দ-প্রয়োগের প্রণালী যাহাতে সুন্দররূপে উপযুক্ত লোকের দ্বারা আলোচিত হয় এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য রীতিমত শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থা হওয়া কর্ত্তব্য। আবশ্যক হইলে এই প্রকার সাহিত্য-সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশনে ঐ ঐ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি আলোচিত হইয়া, উপযুক্ত বিচারকের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার পর, প্রবন্ধ-লেখকের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য পদকাদি পুরস্কার দেওয়াও কর্ত্তব্য।

(৪) দেশের প্রাচীন কিম্বদন্তী প্রভৃতির সম্যক্ আলোচনা করিয়া, দেশের পুরা-কাহিনীর তথ্য সংগ্রহ করা, তাহা যাহাতে রীতিমত প্রকাশিত হয়, তাহার সুব্যবস্থা করা। দেশমধ্যে এমন অনেক স্থান আছে যে, তত্তৎদেশবাসীর বৃত্তান্ত, তথাকার প্রাচীন বংশ এবং তত্তৎদেশের বিবরণ ঠিক

সাহিত্যে (কি প্রাচীন, কি বর্ত্তমান) এখনও স্থান পায় নাই। তাহার যদি রীতিমত সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে কত যে তথ্য প্রকাশিত হইয়া দেশের তমসাচ্ছন্ন যুগের কত গৌরবের কাহিনা সাধারণের গোচরে আসিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকেরা যদি নিজ নিজ দেশ বা পল্লীর প্রাচীন কাহিনী এবং তত্তৎস্থানের প্রচলিত শব্দাদির সংগ্রহ করা তাঁহাদের জীবনের পণ করেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে, অচিরে আমাদের ঐতিহাসিক সাহিত্য কেমন সুন্দর ভাবে পুষ্ট হইবে। এই প্রকার অনুসন্ধানাদি আরম্ভ হইলে, ইহার ফলে বঙ্গদেশের সম্পূর্ণাবয়ব একখানি সামাজিক ইতিহাস রচিত হইবার পথ বিশেষভাবে সুগম হইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এ দেশে প্রায় এমন গ্রাম বা পল্লী নাই, যাহার প্রাচীন বিবরণে দেশের ইতিহাসের মাল-মসলা পাওয়া যাইবে না। আবশ্যক কেবল দেশের লোকের মনোযোগ এবং দেশ-সেবার প্রতি উৎসাহ। এই সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র উদাহরণ দিব। আমাদের দেশের দিকে যাইতে রেল-পথে বসুরহাটের নিকট একটী ষ্টেশনের নাম বেড়াচাঁপা। ঐ গ্রামের ঐ নামের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিয়া শুনিতে পাইলাম, ঐ প্রদেশে একজন মুসলমান বুজরূক ছিলেন। তাঁহারই অমানুষিক ক্ষমতায় তিনি নাকি সামান্য কাষ্ঠের বেড়াতে চাঁপা ফুল ফুটাইয়াছিলেন বলিয়া তদবধি গ্রামের নাম হইয়াছে বেড়াচাঁপা। তারপর ঐ প্রসঙ্গে জনৈক গ্রামবাসী কর্ত্তৃক বাঙ্গালার নবাবের নিকট স্থানীয় মুসলমান

শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগাদি, নবাবের সৈন্য প্রেরণ ইত্যাদি নানা কথা আছে। আমার স্মরণ হইতেছে, যেন ঐ বিবরণটী "পল্লীবাণী"র এক সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল। উক্ত গ্রামেরই সন্নিকটে আর একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, তাহার নাম চাঁপাপুকুরিয়া। গ্রামের নাম সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এই প্রকার :—বহু পূর্ব্বে, যখন এ দেশে রেল-লাইন হয় নাই, তখন চাঁপানাম্নী একটী পতিতা রমণী বৃন্দাবন যাওয়া উপলক্ষে ঐ গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন বড় গ্রীষ্মের সময়; বোধ হয় চৈত্রের শেষ—বৈশাখ, কি জ্যৈষ্ঠ মাস হইবে। ঐ গ্রামে অবস্থিতিকালে চাঁপা দেখিতে পাইল যে, গ্রামে জল অভাবে মানুষের অশেষ কষ্ট, এমন কি, মাঠের গরু প্রভৃতি পশুরাও দ্বিপ্রহরে মাঠের মধ্যে জলপান উদ্দেশ্যে খানা-ডোবা প্রভৃতির দিকে যাইয়া পানীয় জল না পাওয়াতে হাম্বা রব করিতে করিতে ভূমিশায়ী হইতেছে এবং মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া চাঁপার মন বড়ই ব্যাকুল হইল। সে বৃন্দাবনে যাইয়া শেষ জীবন স্বচ্ছন্দে কাটাইবে বলিয়া যে অর্থ সঙ্গে লইয়া যাইতেছিল, তাহার দ্বারা তীর্থ গমন না করিয়া, ঐ গ্রামের জল-কষ্ট নিবারণের জন্য একটী পুষ্করিণী খননের ব্যবস্থা করিল এবং বলিল যে, এই গ্রামে জল-কষ্ট নিবারণ করিতে পারিলে তাহার বৃন্দাবন যাওয়ার অপেক্ষা অধিকতর পুণ্য সঞ্চয় হইবে। তদবধি ঐ পুষ্করিণীর নামানুসারে গ্রামের নামকরণ হইল। এতদ্দ্বারা আপনারা অনুভব করিবেন যে, এই ভাবে যদি বঙ্গদেশের সর্ব্ব-

স্থানের, এমন কি, অধিকাংশ স্থানের গ্রাম ও পল্লী এবং তৎস্থানের প্রাচান বংশাদি স্মরণীয় বিষয়ের ইতিকথা সাধারণের গোচরে আইসে, তাহা হইলে বঙ্গদেশের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কত কথা, কত পুরাতন কাহিনী এবং কত চমৎকার উপদেশ-পূর্ণ তথ্য আমাদের গোচরে আসিয়া অশেষ প্রকারে সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিবে। এই সকল কাজের সহিত যদি আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা তাঁহাদের দেশের প্রচলিত শব্দ ও ছড়া সংগ্রহ করিতে মনোযোগী হন, তাহা হইলে ভাষাতত্ত্বের আলোচনাও কত সুগম হইবে এবং ভাষার শব্দ-সম্পৎ কি পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, তাহা আপনারা অনুমান করিবেন। এই সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "রায়-বাঘিনী" নামক পুস্তকের মুখবন্ধে একটী বড় সুন্দর কথা লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, "ইতিহাসের মাল-মস্‌লা সব গ্রামেই আছে, কিন্তু সব গ্রামে বিধু বাবু নাই—এই-ই দুঃখ।" ভরসা করি, মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের এই লেখা ব্যর্থ হইবে না।

আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকদের প্রতি যে কাজের ভার দেওয়া উচিত বলিয়া ইতিপূর্ব্বে লিখিলাম এবং যাহা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি, তাহাতে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে একটী ঘটনার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। আপনারা অনেকেই জানেন এবং আমার বিশ্বাস যে, বর্ত্তমানে শিক্ষিত যুবকবৃন্দও জানেন যে, সুবিখ্যাত Dr. James

A. H. Murray কর্ত্তৃক সম্পাদিত নূতন যে বৃহৎ একখানি ইংরাজী অভিধান Oxford University হইতে প্রকাশিত হইয়াছে,যাহার নাম হইয়াছে A New English Dictionary, ঐ বৃহৎ অভিধানে শব্দাদি সংগ্রহ হইয়া যখন অভিধানের পাণ্ডুলিপি লেখা শেষ হয়, তখন তদুপলক্ষে এক বিরাট ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। সংবাদপত্রে ঐ ভোজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে ইংলণ্ড দেশে যুবকবৃন্দের অসাধারণ অধ্যবসায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া মনে যে কি এক প্রকার অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার সাধ্য নাই। যুবকবৃন্দের মধ্যে যদি এমন কেহ কেহ থাকেন, যাঁহারা ঐ বৃত্তান্ত পাঠ না করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন অচিরে উহা পাঠ করেন এবং বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি কল্পে আমাদের সাহায্য করিয়া মাতৃভূমির প্রতি তাঁহাদের অন্যতম বিশিস্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালনে তৎপর হয়েন। বর্ত্তমানে যুবকবৃন্দের ঐ প্রকার কার্য্যে আসক্তি থাকা এবং সাধারণের সেবা করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি ও তৎপরতার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে, সে জন্য তাঁহারা আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। এই অবস্থায় কি আমরা আশা করিতে পারি না যে, এই সকল অনুসন্ধান-ঘটিত ব্যাপারে তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইবেন না ?

(৫) বাঙ্গালা ভাষায় রচনা-বিষয়ক কয়েকটী কথা। আমাদের দেশে লেখকদের মধ্যে রচনার প্রণালী লইয়া বর্ত্তমানে

কিছু মতভেদ দেখা যাইতেছে। তাহা ভাল, কি মন্দ, তাহার বিচার এখানে করিব না, করিবার প্রয়োজনও নাই। তবে যাঁহারা লেখন-কার্য্যে ব্যাপৃত, তাঁহাদের নিকট গোটাকতক গোড়ার কথা আমি বিনীত ভাবে নিবেদন করিতে চাই। কারণ, এই বিষয়ে লেখক অপেক্ষা বোধ হয়, পাঠকের কথা কহিবার অধিকার অপেক্ষাকৃত কিছু অধিক। যাঁহারা লেখক, তাঁহারা তাঁহাদের ভাবে বিভোর হইয়া নিজ নিজ ভাব সাহিত্যাকারে প্রকাশ করিতেই অনেক সময়ে ব্যস্ত থাকেন বলিয়াই বোধ হয়। অনেক সময়ে আবার নিজেদের চিন্তা-প্রণালী এবং শিক্ষা-প্রণালীর উপর ভাব প্রকাশের ক্ষমতা নির্ভর করে। অর্থাৎ আমি যদি সর্ব্বদা মনোযোগ সহকারে কেবল ইংরাজী ভাষায় রচিত গ্রন্থই পাঠ করি এবং আবশ্যক হইলে যাহা কিছু লিখিতে হয়, তাহা কেবল ঐ ভাষাতেই লিখি, এমন কি, সাংসারিক ও বিষয়-কর্ম্ম-সংক্রান্ত পত্র-ব্যবহারাদি পর্য্যন্ত ইংরাজীতে ভিন্ন মাতৃ-ভাষায় না করি, তাহা হইলে ইহা অস্বাভাবিক নহে যে, বাঙ্গালা ভাষায় লেখা আবশ্যক হইলে এমনই একটা উদ্ভট ভাষার প্রয়োগ হইয়া পড়িবে। ইহার নমুনা শ্রীযুক্ত হারেন্দ্র বাবু আপনাদিগকে ইতঃপূর্ব্বে শুনাইয়াছেন; আমি তাঁহার অভিভাষণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত কিছু করিলাম,—"আমি ল্যাণ্ডো গাড়ীতে ড্রাইভ করিতে করিতে হাবড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া, বেনারসের জন্য বুক করিলাম, ফার্ষ্ট ক্লাসে লোয়ার বার্থ ভেকাণ্ট ছিল না, আপার বার্থে বেডিংটা স্প্রেড্ করিয়া সর্ট ন্যাপ দিবার চেষ্টা করিতেছি,

এমন সময়ে হুইস্‌ল্ দিয়া ট্রেণ ষ্টার্ট করিল।” আবার এই শ্রেণীর লেখক, যাঁহারা ইংরাজী গ্রন্থাদি কেবল আকণ্ঠ পান করিয়াছেন এবং ইংরাজী ভাবে ও ইংরাজী চিন্তাপ্রণালীর সহিত সুপরিচিত হইয়া প্রায় স্বদেশী ভাব ও চিন্তা-প্রণালীর দিক্ দিয়াও যাইতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এমন ভাষায় বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখিয়াছেন, যাহা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে, গ্রন্থ বিশুদ্ধ বঙ্গ-বাণীর সাহায্যে লিখিত হইলেও তাহার লিখন-ভঙ্গী, ভাব-সম্পৎ,সমস্তই নিছক ইংরাজী। এই সকল গ্রন্থ সাধারণ বঙ্গ-ভাষা-ভাষার পক্ষে দুর্বোধ্য হইবার কারণ হইতেছে, ঐ ঐ গ্রন্থে ভাব প্রকাশ করিতে গিয়া গ্রন্থকার অধিকাংশ স্থলেই ইংরাজী গ্রন্থের ভাবরাশি ইংরাজী গ্রন্থে যে প্রকার ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে, কেবল তাহারই আক্ষরিক অনুবাদ করেন মাত্র। উহা বুঝিতে হইলে সেই সেই ভাবপ্রকাশক ইংরাজি বাক্যগুলি স্মরণ না করিলে তাহার অর্থ বুঝা একপ্রকার অসম্ভব। আরও এক কারণ এই যে, মনের যে ভাব আমরা প্রকাশ করিয়া থাকি, তাহা অনেক স্থলে দেশভেদে ও ভাষাভেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মূর্ত্তি গ্রহণ করে। আমি যদি আমাদের দেশের লোকের মানসিক ভাব প্রকাশ করিবার সময়, এই দেশে সেই ভাব যে ভাষায় প্রকাশিত হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বিদেশীয় মূর্ত্তিটি গ্রহণ করি, এবং তাহার বিদেশীয় পরিচ্ছদাদির অনুবাদ মাত্র করি, তাহা হইলে, এদেশের লোকের অনেক সময়ে যে ঐ ভাবের রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিতে হয়,তাহা বিচিত্র নহে। এইপ্রকার লিখনপ্রণালীর প্রধান

দোষ এই ঘটে যে, অনেক স্থলে শব্দার্থ এবং বাক্যার্থ মোটামুটি বুঝিতে পারিলেও উহার ফলিতার্থ যে কি, তাহা প্রায়শঃ অজানিত থাকিয়া যায়। সমস্ত বাক্যের ব্যঞ্জনা যদি অজ্ঞাতই রহিল, তাহা হইলে বাক্যার্থ যে সম্পূর্ণ বুঝিলাম, ইহা কি প্রকারে বলিব? এই ভাবের লিখন-প্রণালীর বিশেষ কোনও উদাহরণ সঙ্কলন করিব না; কারণ, অধুনা উহা এক প্রকার সর্ব্বজন-বিদিত। এই দুইটী দোষই পরিবর্জ্জন করিতে হইবে। স্বর্গীয় সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, "বঙ্গাক্ষরে লিখিত বা মুদ্রিত হইলেই বঙ্গভাষা হয় না; বঙ্গীয় শব্দ বিন্যস্ত হইলেও বঙ্গভাষা হয় না। ভাষা-শরীরের একটী প্রাণ-পদার্থ আছে, সেইটী বাঙ্গালির মত হইলে তবে উহা বাঙ্গালা ভাষা হইবে।" কথাটী সকলেরই বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। ভাষার প্রাণ-পদার্থটী জানিতে হইলে, দেশের লোকের প্রাণটা কি, তাহা জানা অবশ্য কর্ত্তব্য; দেশের লোকের প্রাণটা জানিতে হইলে দেশকে চেনা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। আমরা নিঃসংশয়িতরূপে কি বলিতে পারি যে, আমরা আমাদের দেশকে ঠিক চিনি? যদি ঠিক চিনিতাম, তাহা হইলে আমাদের এ দুর্দ্দশা থাকিত কি? তারপর, কথিত ভাষা ও লিখিত ভাষা লইয়াও বর্ত্তমানে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, লিখিত ভাষার সহিত কথিত ভাষার কোনও প্রভেদ থাকা উচিত নহে। আবার অনেকের মত যে, কথিত ভাষার সহিত লিখিত ভাষার

প্রভেদ অবশ্যম্ভাবী এবং সর্ব্বকালে এ প্রভেদ আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে ও করিবে। আমার বোধ হয়, এই দুই আপাততঃ বিরোধী মতের সামঞ্জস্য বা সমন্বয় করা বিশেষ দুরূহ নহে। যে ভাষা যত অধিক লোক বুঝে, সেই ভাষাই ভাল, এই বিষয়ে মতভেদ নাই; কিন্তু যদি এই মতটী বিনা সঙ্কোচে সর্ব্বত্র চালাইবার প্রথা অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে বিপদ্ বড় কম নহে। সর্ব্বাগ্রে কলিকাতার লোকেরা বলিবেন যে, আমাদের সহরের কথোপকথনের ভাষাই সাহিত্যে প্রচলিত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। উত্তরে ঢাকার লোকেরাও বলিবেন যে, আমাদের সহরের কথোপকথনের ভাষা তাহা হইলে কি দোষে দুষ্ট যে, আমাদের সহরের ভাষা সাহিত্যে তদ্রূপ স্থান পাইবে না? এইরূপ আত্ম-বিরোধ মিটাইবার উপায় কি? পক্ষান্তরে, যদি আবার লিখিত ভাষা হইতে কথিত ভাষাকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিতে যাই, তাহা হইলে ভাষার গৌরব এবং ওজস্বিতার অভাব বা অল্পতা ঘটিয়া, ভাষা দিন দিন প্রাণহীন হইতে বসিবে। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে, এই দুই বিরোধী মতের সমন্বয় ঘটান এবং তৎপ্রতি সহায়তা করা। লৌকিক ভাষার আদিম অবস্থায় এবং উৎপত্তি-কালে, আমরা বর্ত্তমানে যাহাকে সাহিত্যের ভাষা বলি, তাহার অনুরূপ কোনও ভাষা থাকে না, থাকিবার বিশেষ কোনও কারণও থাকে না। ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে হইতে এমন একটী যুগ আসে, যখন ভাষা লিপিবদ্ধ করা

আবশ্যক হইয়া উঠে; তখন হইতে ভাষা লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সাহিত্যের ভাষা সৃষ্ট হয়। স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বাবু ঠিকই বলিয়াছেন,—"রস থিতাইলে তাহাতে দানা বাঁধিয়া যেমন মিছরী হয়, লিপিবদ্ধ হইয়া ভাষাও যেন দানা-বাঁধা গোছের হয়।" আমাদের মাতৃভাষা সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান সাহিত্যের এই প্রকার দানা বাঁধিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করি; সুতরাং এই অবস্থায় এই দানা ভাঙ্গিয়া, পুনরায় নূতন করিয়া দানা বাঁধাইবার চেষ্টা করা কতটা সঙ্গত, তাহা বিবেচনা করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে কি? এতদ্ব্যতীত একই ভাষায় লিখিত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়-ভেদে ভাষার নানা মূর্ত্তি হয়; তাহার প্রতি সর্ব্বাংশে উপেক্ষা প্রদর্শন চলে না। একটু পূর্ব্বে যে সমন্বয়-বিধানের কথা বলিয়াছি, ঐ সমন্বয় একস্থানে বসিয়া কমিটী করিয়া, কোন প্রকার প্রস্তাব গ্রহণের দ্বারা সম্ভব নহে। প্রত্যেক চলিত ভাষা একটী জীবন্ত প্রবাহ-স্বরূপ। উহা নিজেই নিজের খাত প্রস্তুত করিয়া লয়। গিরিস্থিত জলপ্রপাত হইতে যেমন নদী-সকল উৎপন্ন হইয়া, উহারই সঞ্চারিত শক্তির দ্বারা নিয়মিত হইয়া নদীসমূহ বেগবান্ এবং গতিশাল হয় এবং একটী খাতেই প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ দেশ-ভেদে একই ভাষার নানা আকার থাকিলেও, উহারা সকলে যখন এক খাতে পতিত হয়, তখন সেই খাতে প্রবাহিত ভাষা-প্রবাহ, সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা হইয়া উঠে। উহাকেই বোধ হয়, ৺বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভাষার 'দানা-বাঁধা' বলিয়া ব্যাখ্যা

করিয়াছেন। এই প্রকার ভাষার দানা-বাঁধা একদিন ইংলণ্ডেও ঘটিয়াছিল। বর্ত্তমান ইংরাজী ভাষার জননী Anglo Saxon ভাষাও এককালে নানা মূর্ত্তিতে বিরাজ করিত। কিন্তু বিখ্যাত Alfred the Great নামক রাজার আমলে, নানা কারণে তাঁহার রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানের প্রচলিত মূর্ত্তিটী প্রাধান্য লাভ করিয়া, Anglo Saxon নামক সাহিত্যের ভাষা গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই প্রকার গঠন যে কি কি কারণে ঘটে, তাহার প্রসঙ্গ এখানে তুলিয়া আপনাদের বিরক্তি-ভাজন হইব না। উহা যে ঘটে, তাহা সত্য; সুতরাং ভাষার 'দানা-বাঁধা'র কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই আর 'দানা-বাঁধা' যদি স্বীকার করিতেই হইল, তাহা হইলে দানা ভাঙ্গার কার্য্যটাকে ভাল বলিব কি প্রকারে? সুতরাং এই বিষয়ে স্বর্গীয় সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত আমার অনেকটা এক মত। সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন,—"প্রাণের আবেগে ভাষার সৃষ্টি এবং উন্নতি। নিম্ন স্তরের লোকের এখনও যৎকিঞ্চিৎ প্রাণ আছে—তাহাদের ভাষা অসাধু বা অকুলীন বলিয়া অবহেলা না করিয়া, সংস্কৃত-সম বা সংস্কৃতোদ্ভব ভাষার সহিত ভূয়ঃপরিমাণে দেশজ মিশাইয়া লইতে পারিলে ভাষার প্রাণ থাকিবে বা হইবে।" মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কি বলিয়াছেন, প্রণিধান করুন; তিনি বলেন,—"দেশের লোক যে সকল শব্দ বুঝে, অথচ সত্য সত্য ইতুরে কথা নয়, যে সকল কথা ভদ্রলোকের কাছে বলিতে আমরা লজ্জিত হই না, সেই

সকল কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করিলে লোকে সহজে বুঝিতে পারিবে, ভাষাও ভাল হইবে।" আমরা যদি দেশকে ঠিক চিনিতে চেষ্টা করি, দেশের ভাবপ্রবাহ ধরিয়া দেশের মর্ম্মস্থান খুঁজিয়া পাই, দেশের প্রাচীন সাহিত্যাদি তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে আরম্ভ করি, এবং দেশের প্রাচীন বিবরণ ও কাহিনী প্রভৃতি জানিতে আমাদের প্রকৃত আসক্তি জন্মে, তাহা হইলে আমাদের মাতৃভাষায় সাহিত্য যে আকারে গঠিত হইবে, তাহা স্থির কবিবার জন্য আমাদের ব্যস্ততার আবশ্যকতা ঘটিবে না ; ভাষা আপনা আপনিই তখন আপনার যথার্থ আকার গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। যাঁহারা আমাদের ভাষার 'দানা-বাঁধা'র কথা স্বীকার করেন না বা যাঁহারা উহাতে কেবল কোমলশ্রদ্ধমাত্র, তাঁহাদের এই কথা ভাবিয়া বর্ত্তমান কালে টানাটানির ভাবটা কতক সংযত করিলে মন্দ হয় না।

স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বাবু বলিয়াছেন, "সংস্কৃত ব্যাকরণের দাসত্ব করিতে হইলে বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকৃতপক্ষে কখনই স্বতন্ত্র হইতে পারিবে না, আর যদি না হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষা কখন আত্ম-গৌরবসম্পন্ন হইবে না।" এই কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধান করা আমাদের অতীব কর্ত্তব্য। কিন্তু বিচার্য্য এই যে, বাঙ্গালা ভাষাকে ৺ইন্দ্রনাথ বাবু যে ভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে পৃথক্ করিতে চাহেন, তাহা আদৌ সম্ভব কি না? ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছি যে, খাঁটি বাঙ্গালায় নাকি সন্ধি-সমাস, তদ্ধিত, কৃৎ প্রভৃতি প্রত্যয় আদৌ নাই। ৺বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়

ঠিক সম্পূর্ণরূপে এই মত পোষণ করিতেন কি না, তাহা বলিতে পারি না। তবে তিনি যে লিখিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় "যে সকল শব্দ অবিকল সংস্কৃত, সেগুলি বাদ দিলে অন্য কোন অংশে সন্ধি চলে না।" এই কথা দেখিয়া আমি যে ভয় পাই নাই, বুকে হাত দিয়া শপথ করিতে পারি না। যাহা হউক, তিনি বোধ হয়, সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি, সমাস, তদ্ধিত ও কৃৎপ্রত্যয় সংক্রান্ত নিয়মের অধীন বঙ্গভাষা নহে, ইহাই বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু এমন শিক্ষিত লোকের অভাব নাই, যাঁহাদের ধারণা যে, খাঁটি বাঙ্গালাভাষায় সন্ধি এবং সমাসের কার্য্য হয় না। এই মতটা কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারি না; কারণ, প্রতি পদেই সন্ধির কার্য্য এবং সমাসের প্রয়োগ দেখিতেছি। ইহা সত্ত্বেও যদি কেহ স্বীকার না করেন যে, বাঙ্গালায় সন্ধি, সমাস, তদ্ধিত ও কৃৎপ্রত্যয় আছে, তবে তাঁহাদের সহিত তর্ক করার চেষ্টা দুরাশা মাত্র। আমরা যে ভাষায় কথা কহি, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে আপনারা দেখিবেন যে, পাঁজ্জন, যদ্দিন, চচ্চড়, চোড়্‌দা, জুতাজুতি, ছোরাছুরি, কিলোকিলি প্রভৃতি যে সকল শব্দ আমরা ব্যবহার করি, তাহাদের মধ্যে কি সন্ধি ও সমাসের কার্য্য স্পষ্ট নহে? দুইটী পৃথক্ ধ্বনি একত্র পাশাপাশি আসিলেই দ্রুত উচ্চারণের চেষ্টায় অনেক স্থলে নিশ্চয় উভয় ধ্বনি মিশ্রিত হইবেই; মিশ্রিত হইলেই কি ভাবে যে তাহারা মিশ্রিত হইবে, তাহা প্রধানতঃ ধ্বনি দুইটীর প্রতি আপেক্ষিক জোর (accent) দেওয়া এবং উভয় ধ্বনির উচ্চারণ-স্থানের সংস্থানের উপর নির্ভর করিবে। এইটী হইল

সন্ধি-সংক্রান্ত সাধারণ ও ব্যাপক নিয়ম। এই নিয়মের ব্যভিচার বড় একটা নাই বলিলেই চলে; কিন্তু তথাপি একটী ভাবিবার কথা আছে। ৺ ইন্দ্রনাথ বাবু দেখাইয়াছেন যে, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বর্ণমালার অনেক অক্ষর একাকৃতি হইলেও উহার উচ্চারণ উভয় ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, যেখানে ঠিক সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইয়াছে, সেইখানে ঐ ঐ শব্দের অক্ষর যদি সন্নিকৃষ্ট হয় এবং উহার উচ্চারণ উভয় ভাষায় পৃথক্ পৃথক্ হয়, তখন সন্ধি প্রভৃতির কার্য্য কোন্ নিয়মানুসারে হইবে? অর্থাৎ উহা কি সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রাদির অনুরূপ হইবে, না, খাঁটি বাঙ্গালার সন্ধি-সূত্রানুসারে, না উভয় নিয়মের মিশ্রিত কোন নিয়মানুসারে হইবে? অন্য কথায় বলিতে গেলে প্রশ্নটা এই দাঁড়ায়—ঐ প্রকার স্থলে সন্নিকৃষ্ট অক্ষরের সন্ধিক্রিয়া কি স্বাভাবিক নিয়ম মানিয়া চলিবে, না স্পষ্ট ধ্বনির দিকে লক্ষ্য না করিয়া, সাঙ্কেতিক ধ্বনিমাত্র কল্পনা করিয়া সন্ধিক্রিয়া সাধিত হইবে? এই কথাটা অদ্যাবধি কোনও সুধী বিশেষ চিন্তা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। এই কথাটা ভাল করিয়া জানাও বোধ হয় অনেকের ছিল না। যাহা হউক, এই বিষয়ে আলোচনা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই, সুতরাং ইহার সম্পর্কে কোনও মত প্রকাশ করা সম্ভব নহে—আমার পক্ষে ত স্পষ্ট ধৃষ্টতা। ইহার আলোচনা ও বিচার সুধীবর্গ করেন, ইহাই প্রার্থনা। সন্ধির পক্ষে যাহা বলিলাম, সমাস, তদ্ধিত প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাহা

খাটে। কেহ কেহ বলেন—সংস্কৃত ভাষা হইতে সন্ধি-ক্রিয়া-বিশিষ্ট এবং সমাস-নিবন্ধ শব্দই যখন গ্রহণ করিব, তখন খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সকল আপদ্-বালাই ঢুকানের দরকার কি? কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে এই কথার অসারতা বুঝিতে বড় বিলম্ব হওয়া উচিত নহে। এই সংঘর্ষের দিনে ভাষায় নূতন নূতন শব্দ-সৃষ্টি করা অনিবার্য্য; শব্দ সৃষ্টি করিতে প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তাহা যদি হইল, তবে আমাদের যে সমস্ত নূতন শব্দের প্রয়োজন হইবে, তাহাই যে আমরা সংস্কৃত কোষাদি হইতে সন্ধি ও সমাস-নিষ্পন্নভাবে পাইব, ইহার নিশ্চয়তা কি? সে নিশ্চয়তার বোধ হয়, অত্যন্তাভাব ঘটিবে। আমাদিগকে সংস্কৃত শব্দটাকে মূল করিয়া অনেক সময়ে গড়িয়া পিটিয়া লইতে হইবে। গড়া-পেটার কাজটা যেন কতকাংশে খাঁটি বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে হইতে পারে; কিন্তু অনেক স্থলে এমন অনেক কথা রচনা করিতে হইবে, যাহার জন্য সংস্কৃত ভাষার নিয়মাবলী জানা অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। ফলে, খাঁটি বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাবলী এককালে বিসর্জ্জন দিলে, কিংবা উভয় ব্যাকরণের মধ্যে দুর্ভেদ্য এক প্রাচীর উঠাইলে, লেখকগণের যে কি মহাবিপদ্ উপস্থিত হইবে, তাহা ভাবিয়া ত আমি আকুল হইয়া পড়ি। সুতরাং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বর্ত্তমান মতটী সত্যের বিশেষ প্রকারে অতিশয় অতিরঞ্জন (excggeratein) ভিন্ন আর কিছুই নহে। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ হইতে খাঁটি

বাঙ্গালার ব্যাকরণ পৃথক্ আছে ও থাকিবে, এবং বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য উহা পৃথক্ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ইহা বলিয়া যে খাঁটি বাঙ্গালার ব্যাকরণ হইতে সংস্কৃত ব্যাকরণ-নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে, এই প্রকার মত কখনই প্রয়োজনীয় বা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। সাধু ভাষা এবং গ্রাম্যভাষা, এতদুভয়ের মধ্যে আমাদের সাহিত্যে কোন্ ভাষা চলা উচিত, এই প্রসঙ্গে মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ আমাদিগকে মধ্য পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন ; তাহাই বোধ হয়, শ্রেয়ঃ পথ। সংস্কৃত ব্যাকরণের নির্ব্বাসন ঘটাইলে, বাঙ্গালা ভাষার লেখকদিগের কত যে সংস্কৃত শব্দ মুখস্থ করিতে হইবে, তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয় এবং এত মুখস্থ করা সম্ভবও নহে, উচিতও নহে। যখন দেখিতেছি যে, গোটাকতক (অন্ততঃ ব্যবহর্ত্তব্য শব্দসমূহের তুলনায় নিতান্ত অল্প) সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র জানা থাকিলে ঐ কার্য্য সহজে সুসাধিত হইতে পারে, তখন এতটা মুখস্থ করার চাপ কেন বহন করিতে যাইব ?

আর এক কথা বলিয়াই এই অভিভাষণের উপসংহার করিব। আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাপ্রদান করার উদ্দেশ্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ বলিয়া, আমাদের দেশবাসীর কর্ত্তব্য কি, তাহা বোধ হয় একটু বিস্তারিতরূপেই বলিয়াছি। এখন আমাদের কর্ত্তব্য সাধন সম্পর্কে কি কি অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয় এবং আশু কর্ত্তব্য, তাহা বলিতেছি। ভাষার ভাব-সম্পৎ এবং

জ্ঞান-ভাণ্ডার বৃদ্ধিকল্পে এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, যাহাতে এবং যাহার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অনুবাদ-নানা বিদ্যা-সংক্রান্ত নানা বিষয়ে উৎকৃষ্ট মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা; দেশীয় প্রাচীন কাহিনী ও প্রাচীন সাহিত্যাদি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা ও প্রচার করা ইত্যাদি আমাদের যাবতীয় কর্ত্তব্য আছে, তাহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্য উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ, উপযুক্ত লোকের প্রতি বিষয়-ভেদে ভার দিবার ব্যবস্থা আপনারা করুন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎই আপনাদের এক প্রকার কার্য্যকরী (Executive) সমিতি ভাবে কাজ করিয়া আসিতেছে; তাহার উপর কাজের ভার দিন, এবং কত দূর কার্য্য পরিষৎ করে, তাহার হিসাব নিকাশ বর্ষে বর্ষে বুঝিয়া লউন। শুধু মুখে মুখে ভার দিলে এই প্রকার কার্য্য হইবার নহে—ইহার জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন; ইহার জন্য শিক্ষিত বঙ্গবাসীর অনেক সময়ে স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন; ইহার জন্য দেশের প্রতি প্রবল অনুরাগের প্রেরণা আমাদের মধ্যে উৎপন্ন না হইলে এবং প্রবৃত্তি ঐ দিকে জাগিয়া না উঠিলে কিছুই হইবে না। ইহার জন্য আপনারা সকলে সমবেত চেষ্টা করুন। আমার বলা বাহুল্য, আপনারা সকলেই জানেন যে, জাতীয় ভাষা—আমাদের মাতৃ-ভাষা—সমৃদ্ধ না হইলে জাতীয় উন্নতি বা আমাদের উন্নতি হইতেই পারে না; যাঁহারা করিতে যান, তাঁহারা মোহান্ধ। তাঁহাদের কার্য্য ব্যর্থ হইবেই। অতএব সকলে আসুন, একমত ও একপ্রাণ

হইয়া এই কার্য্যের অনুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করি। অনেক সময় আপনাদের নষ্ট করিয়াছি,—আমার কর্কশ বাক্যে আপনাদের সকলকেই বিরক্ত করিয়াছি,—ভরসা করি, আমার তজ্জনিত ত্রুটি আপনারা ক্ষমা করিবেন।

আমার এই সকল বাক্যে আপনারা যদি আকৃষ্ট না হয়েন, আমার প্রতিপাদ্য বিষয়ে আপনাদিগকে যে আকৃষ্ট করিবে, তাহাতে আমার সন্দেহমাত্র নাই। সর্ব্বোপরি আছে,—আমাদের সেই পূত মন্ত্র "বন্দেমাতরং"। আসুন, সকলে একবাক্যে পূর্ণ ভক্তি সহকারে বলি "জয় বঙ্গবাণীর জয়।"

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে
শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।